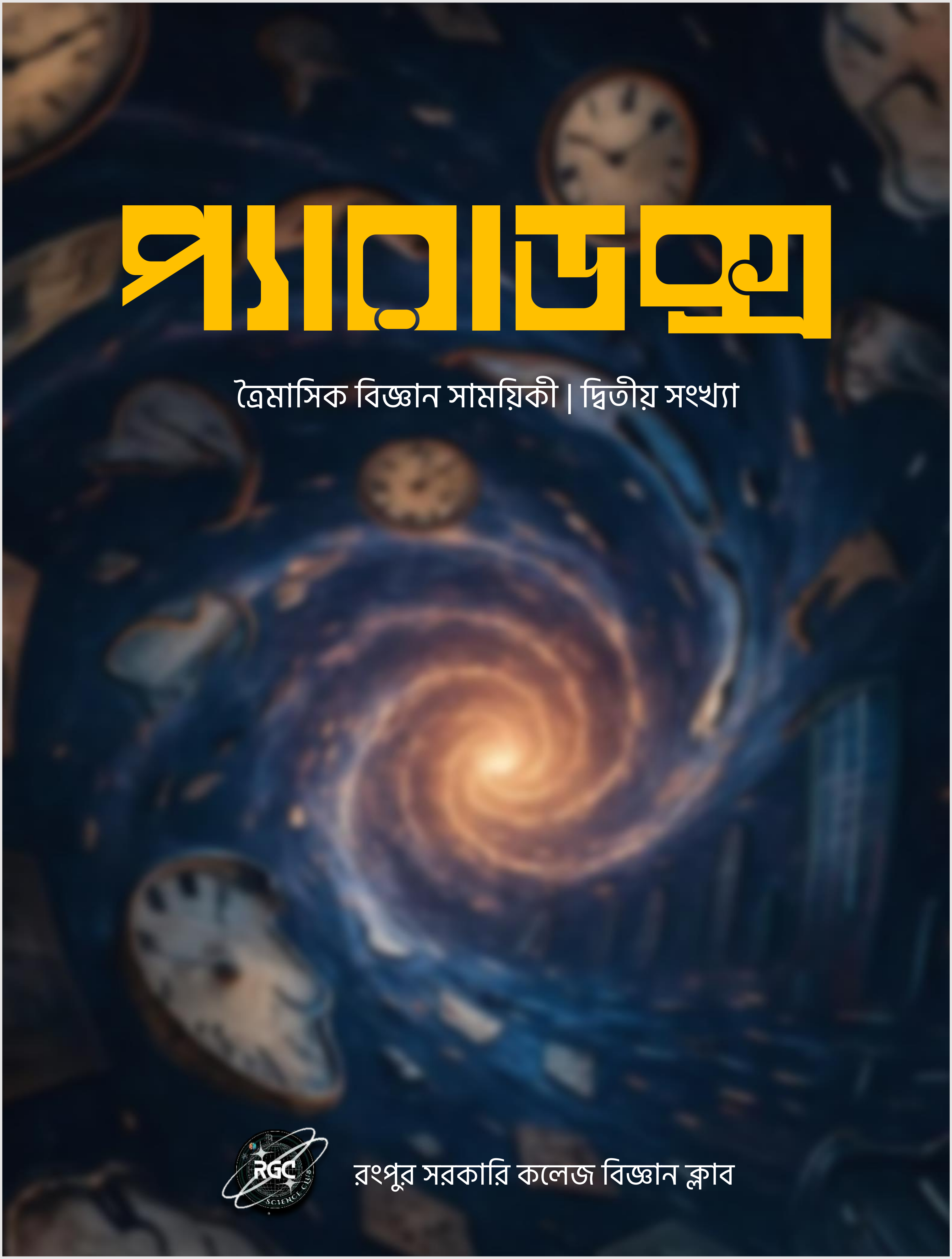

প্যারাডক্স

ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী | দ্বিতীয় সংখ্যা

রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব

প্যারাডক্স

ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী | দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদনা

আহসান হাবিব

ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেশন

সজীব শাহরিয়ার

প্রুফ-রিডার

আফিয়া জৌলুশ ঐশী

সূচিপত্র

P-5 সাইন্স নিউজ

ফিল্ডস মেডেল P-9

P-12 সময় কেন দ্রুত চলছে

ভ্যানেরা মিশন P-16

P-28 টাইম ট্রাভেল, কাল্পনিক নাকি বাস্তব

সাইন্স ফিকশনঃ Error P-31

P-43 বিজ্ঞান রহস্য-২

পরার্থপর বিজ্ঞান P-50

P-51 প্রশ্নপর্বঃ আরও একবার ভাবো

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা,

বিজ্ঞানচর্চাকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে পাঠকদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশে রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ত্রৈমাসিক ই-ম্যাগাজিন ‘প্যারাডক্স’ (PARADOX)-এর এই পথচলা।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানের জটিল ও বিস্ময়কর বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরা এবং বিজ্ঞানমনস্ক এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

এই ম্যাগাজিনে থাকবে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং গবেষণামূলক লেখা, যা তাদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তির এই যুগে নতুন কিছু শেখার ও জানার প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে।

-রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব

SCIENCENEWS

বিজ্ঞানের দুনিয়ায় সাম্প্রতিক ছয়টি যুগান্তকারী অগ্রগতি

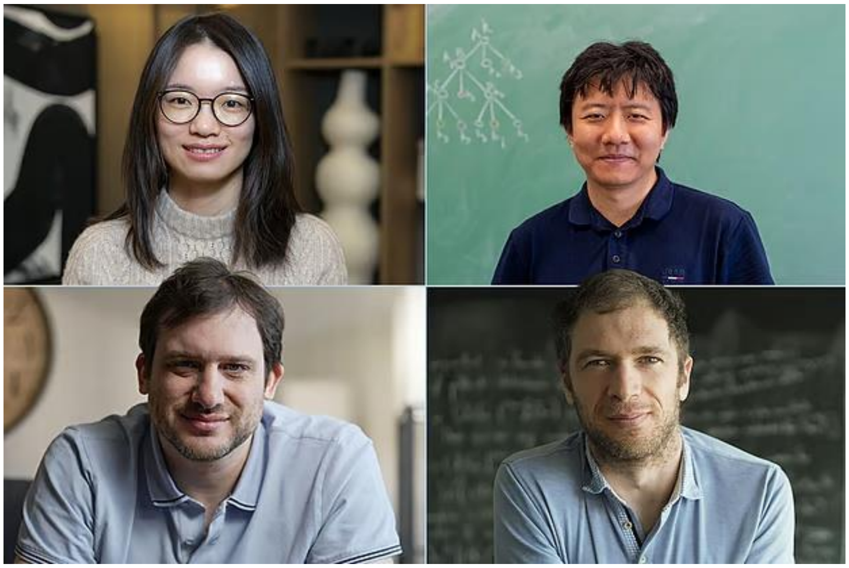

১. গণিতের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ফিল্ডস মেডেল’ পেলেন চার অসাধারণ গণিতবিদ

গত ২৩ জুলাই ২০২৬-এ গণিতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ‘ফিল্ডস মেডেল’ চারজন বিশিষ্ট গণিতবিদ—ইউ ডেং (Yu Deng), জন পারডন (John Pardon), জ্যাকব জিমারম্যান (Jacob Tsimerman) এবং হং ওয়াং (Hong Wang)-কে প্রদান করা হয়েছে। এ বছরের পুরস্কারে বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছেন হং ওয়াং, যিনি ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় নারী হিসেবে এই সম্মান অর্জন করেছেন । তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি। অন্যদিকে ইউ ডেং গ্যাসের গতিবিদ্যায় ব্যবহৃত বোল্টজম্যান সমীকরণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলোকে গণিতের মাধ্যমে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

২. বাসযোগ্য অঞ্চলের পাথুরে গ্রহে প্রথমবার নিশ্চিত হলো বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব

জুলাই ২০২৬-এ হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৮ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ‘LHS 1140 b’ নামের একটি এক্সোপ্ল্যানেটে বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। গ্রহটি তার নক্ষত্রের বাসযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর পরিবেশ অনেকটাই পৃথিবীর মতো বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা গ্রহটি থেকে ধীরে ধীরে হিলিয়াম গ্যাস নির্গত হতে দেখেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি দীর্ঘ সময় ধরে নিজের বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভিনগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৩.‘ন্যানোজাইম’ তত্ত্ব প্রাণের উৎপত্তির রহস্য উন্মোচনে নতুন দিগন্ত খুলছে

পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা কীভাবে হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরা জুন ২০২৬-এ একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে, প্রাচীন পৃথিবীতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র খনিজ কণা বা ‘ন্যানোজাইম’ গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। আগ্নেয়গিরি ও জিওথার্মাল উৎসের উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের পরিবেশে এই কণাগুলো জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে প্রাণের প্রথম মৌলিক অণু গঠনে সহায়তা করেছিল। এই তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

৪. গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে দূরে এক ভবঘুরে ব্ল্যাকহোলের নাটকীয় আবিষ্কার

জুলাই ২০২৬-এর শেষ দিকে নাসার সুইফট অবজারভেটরি একটি বিরল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ করেছে। বিজ্ঞানীরা একটি দূরবর্তী গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থানরত একটি বিশাল ‘ভবঘুরে’ ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করেন। ব্ল্যাকহোলটির কাছাকাছি চলে আসা একটি নক্ষত্র এর শক্তিশালী মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সেই প্রক্রিয়ায় তীব্র অতিবেগুনি বিকিরণ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা ব্ল্যাকহোলের আচরণ এবং গ্যালাক্সির বিবর্তন সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করতে পারে।

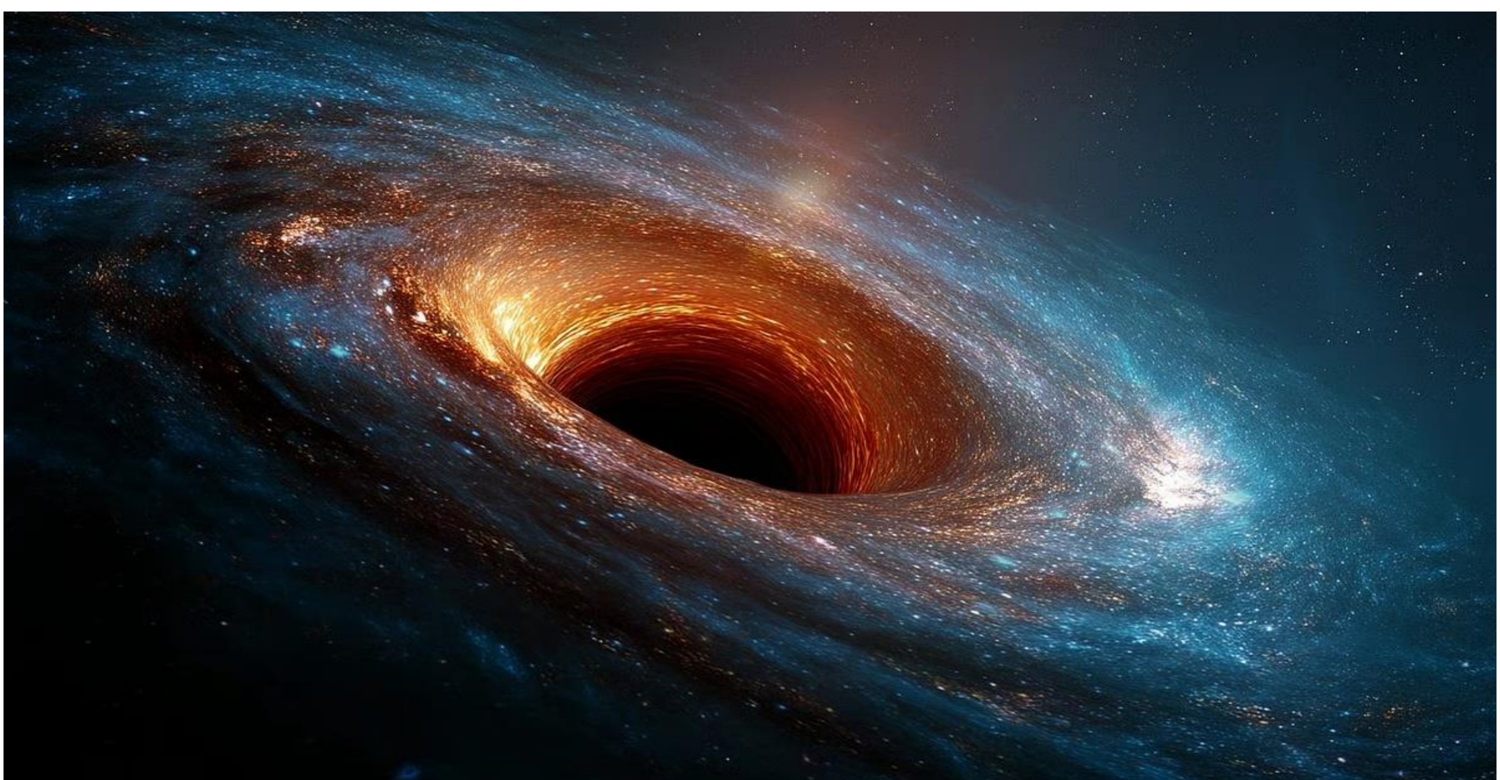

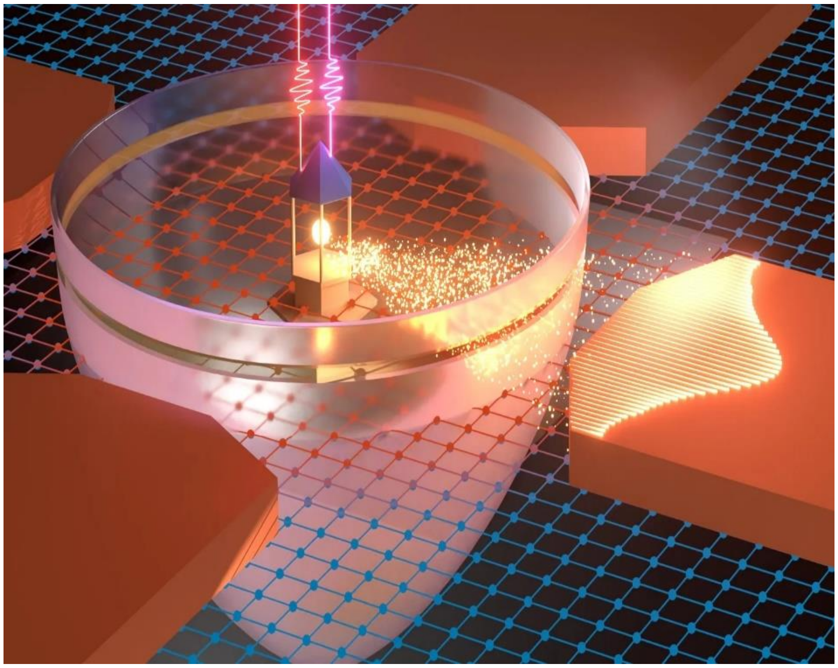

৫. লেজারের আলো দিয়ে ইলেকট্রন নিয়ন্ত্রণে তৈরি হলো ‘ইলেকট্রন লাইটহাউস’

ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের গবেষকরা এমন একটি সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা কোনো বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াই কেবল লেজার আলোর সাহায্যে ইলেকট্রনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দুটি ভিন্ন রঙের লেজার পালস ব্যবহার করে তারা নির্দিষ্ট দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রযুক্তিকে ‘ইলেকট্রন লাইটহাউস’ নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ এটি অনেকটা বাতিঘরের আলোর মতো ইলেকট্রনকে নির্দেশনা দেয়। ভবিষ্যতে অপটিক্যাল সেন্সর, টেলিযোগাযোগ এবং উন্নত ইমেজিং প্রযুক্তিতে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হতে পারে।

৬. জেমস ওয়েব, হাবল ও ইউক্লিড টেলিস্কোপের নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হলো মহাকাশ গবেষণা

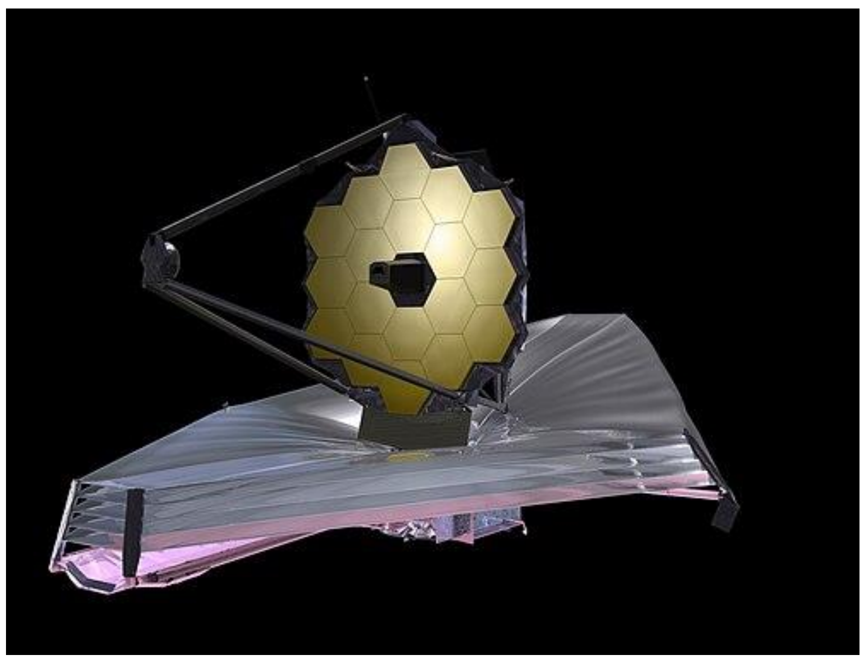

জুলাই ২০২৬-এ বিশ্বের তিনটি শীর্ষস্থানীয় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ যন্ত্র নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ‘বেটা পিকটোরিস’ নক্ষত্রমণ্ডলে একটি নতুন গ্রহ শনাক্ত করেছে। একই সময়ে ইউক্লিড টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী কোয়াসারগুলোর একটি আবিষ্কার করেছে। অন্যদিকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ‘ওমেগা সেন্টারি’ স্টার ক্লাস্টারের কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করা একটি ইন্টারমিডিয়েট-মাস ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এসব আবিষ্কার মহাবিশ্বের গঠন, বিবর্তন এবং রহস্যময় বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে।,

2026

FIELDS MEDAL

কাঠামোগত জ্যামিতি ও সংখ্যার ডিসট্রাকশন

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় সর্বোচ্চ অর্জনের জন্য নোবেল পুরস্কারের প্রচলন থাকলেও, বিশুদ্ধ গণিতে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। আলফ্রেড নোবেল তার উইলে গণিতকে কেন বাদ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা রয়েছে এবং একজন গনিতপ্রেমী হিসেবে ব্যাক্তিগতভাবে ছোট থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে আমার অনেক আক্ষেপ। এর বিকল্প হিসেবে গণিতবিদদের জন্য সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি হয়ে উঠেছে ফিল্ডস মেডেল (Fields Medal), একেই বলা হয় গনিতের নোবেল। প্রতি চার বছর পর পর এই পদক দেওয়া হয়। তবে এখানে একটি মজার নিয়ম রয়েছে । ৪০ বছর বয়স এর বেশি কাউকে এই পদক দেওয়া হয় না। অনেকেই এই নিয়মটিকে বৈষম্যমূলক মনে করেন। একজন বিজ্ঞানী হয়তো তার জীবনের সেরা আবিষ্কারটি ৫০ বছর বয়সে করতে পারেন, তাহলে গণিতে কেন এই বয়সের বাধ্যবাধকতা? এর পেছনে যে কারণটি রয়েছে তা হলো এই পদক কারো সারা জীবনে করা কাজের কোনো পুরষ্কার নয় বরং এটি যাতে তরুণদের অনুপ্রাণিত করে গণিত নিয়ে কাজ করতে সেই জন্য।

এবারের অন্যতম ফিল্ডস মেডেলজয়ী হলেন হোং ওয়াং (Hong Wang)। গণিতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় নারী হিসেবে তিনি এই বিরল স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সী এই গবেষকের কাজের মূল ফোকাস ছিল 'রেসট্রিক্টেড প্রজেকশন থিওরি' (Restricted Projection Theory) এবং ফুরিয়ার বিশ্লেষণ (Fourier analysis)। তার এই গবেষণার গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের 'কাকেয়া কনজেকচার' (Kakeya conjecture) নামক একটি ক্লাসিক্যাল গাণিতিক সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। ১৯১৯ সালে জাপানি গণিতবিদ সোইচি কাকেয়া একটি অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। দ্বিমাত্রিক সমতলে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেখা বা সূঁচকে তার নিজের অক্ষে সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানোর জন্য ন্যূনতম কতটুকু ক্ষেত্রফল বা এরিয়া প্রয়োজন?

প্রথম দেখায় মনে হতে পারে, সূঁচটির দৈর্ঘ্য যদি ১ একক হয়, তবে এটিকে ঘোরানোর জন্য ব্যাসের সমান একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রফলের প্রয়োজন হবে। কিন্তু গণিতবিদ আব্রাম বেসিকোভিচ প্রমাণ করেছিলেন, এই ক্ষেত্রফলকে গাণিতিকভাবে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব! একটি বিশেষ জ্যামিতিক আকার তৈরি করে, রেখাটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে এমনভাবে ঘোরানো যায়, যেখানে ঘূর্ণন সম্পূর্ণ হবে কিন্তু কোনো অতিরিক্ত জায়গা নষ্ট হবে না। এটি কাকেয়া সেট নামে পরিচিত। দ্বিমাত্রিক স্থানের জন্য এই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলেও, সমস্যা শুরু হয় উচ্চ-মাত্রায় (Higher dimensions)। ত্রিমাত্রিক বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার স্পেসে এই কাকেয়া সেটের আচরণ কেমন হবে? মাত্রার সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে জ্যামিতিক কাঠামোর ভলিউম বা আয়তন কীভাবে সংকুচিত বা প্রসারিত হয়?

হোং ওয়াং ঠিক এই জায়গাটিতে কাজ করেছেন। তিনি তার রেসট্রিক্টেড প্রজেকশন থিওরির মাধ্যমে দেখিয়েছেন, উচ্চ-মাত্রার কোনো জ্যামিতিক বস্তুকে যখন নিম্ন-মাত্রায় অভিক্ষেপ বা প্রজেক্ট করা হয়, তখন তার নিজস্ব জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে যায় না। থ্রিডি স্পেসের একটি বস্তুর যখন টুডি স্পেসে ছায়া পড়ে, তখন সেই ছায়ার ভেতরেও মূল বস্তুর গাণিতিক ইনফরমেশন লুকিয়ে থাকে। মাত্রা পরিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়ায় আকারগুলোর আচরণ র‍্যান্ডম

হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হোং ওয়াং জ্যামিতিক পরিমাপ তত্ত্ব ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন, কাকেয়া সেটের মতো জটিল কাঠামোগুলো উচ্চ-মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক বিন্যাস মেনে চলতে বাধ্য। ফুরিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, তরঙ্গ বা তরঙ্গের মতো কাজ করে এমন যেকোনো ভৌত অস্তিত্ব মাত্রা পরিবর্তনের সময় কীভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে।

এই তত্ত্বের প্রয়োগ কেবল বিমূর্ত গণিতে সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক রাডার প্রযুক্তি, সিগন্যাল প্রসেসিং (Signal processing) এবং আংশিক ব্যবকলনীয় সমীকরণের (Partial differential equations) ক্ষেত্রে এর সরাসরি গাণিতিক প্রয়োগ রয়েছে। রেডিও তরঙ্গ যখন মহাকাশের বিভিন্ন মাত্রা ও স্তরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছায়, তখন তরঙ্গের সিগন্যাল কীভাবে বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই বিক্ষিপ্ত সিগন্যাল থেকে কীভাবে মূল তথ্য উদ্ধার করা যায়, তার একটি গাণিতিক মডেল হোং ওয়াং-এর এই প্রজেকশন থিওরি থেকে পাওয়া সম্ভব।

২০২৬ সালের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ফিল্ডস মেডেলজয়ী হলেন জ্যাকব জিমারম্যান (Jacob Tsimerman)। ৩৮ বছর বয়সী এই গণিতবিদ কানাডার টরন্টো ইউনিভার্সিটির গবেষক। তার কাজের মূল ক্ষেত্রটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক—বীজগণিতীয় জ্যামিতি (Algebraic geometry) এবং সংখ্যাতত্ত্বের (Number theory) সংযোগস্থল। গণিতের এই দুটি শাখা ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। জ্যামিতি কাজ করে স্থান, তল, বক্ররেখা এবং নিরবচ্ছিন্ন আকার নিয়ে। সংখ্যাতত্ত্ব কাজ করে বিচ্ছিন্ন সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা এবং ডায়োফ্যান্টাইন সমীকরণ নিয়ে। জিমারম্যান মূলত 'আন্দ্রে-উর্ট কনজেকচার' (André-Oort conjecture) প্রমাণের মাধ্যমে এই দুই ভিন্ন জগতের মধ্যে একটি নিশ্ছিদ্র সেতু তৈরি করেছেন।

আন্দ্রে-উর্ট কনজেকচার বুঝতে হলে আমাদের শিমুরা ভ্যারাইটি (Shimura varieties) সম্পর্কে জানতে হবে। শিমুরা ভ্যারাইটি হলো এমন এক ধরনের জটিল জ্যামিতিক স্পেস, যা সংখ্যাতত্ত্বের অত্যন্ত গভীর কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এই স্পেসের ভেতরে অসংখ্য বিন্দু থাকে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু বিশেষ বিন্দু থাকে, যাদের বলা হয় 'স্পেশাল পয়েন্ট' বা 'সিএম পয়েন্ট' (CM points)। এই বিন্দুগুলোর গাণিতিক আচরণ অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং এরা পাটিগণিতীয় উপাত্তের একটি বিশাল ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। জিমারম্যানের গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল, একটি সুবিশাল জ্যামিতিক স্পেসে এই বিশেষ বিন্দুগুলো কীভাবে বিন্যস্ত থাকে? তারা কি পুরো স্পেস জুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে, নাকি তাদের অবস্থানের পেছনে কোনো অদৃশ্য গাণিতিক নিয়ম কাজ করে?

জিমারম্যান গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, এই বিশেষ বিন্দুগুলো স্পেসে বৃহৎ পরিসরে অবস্থান করলে তারা কখনোই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে না। পিলা-জানিয়ার (Pila-Zannier) কৌশল নামক একটি অত্যন্ত জটিল গাণিতিক মেকানিজম ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন, যখনই কোনো স্পেসে এই বিশেষ বিন্দুগুলোর একটি সিকোয়েন্স তৈরি হয়, তখন বিন্দুগুলোকে আবশ্যিকভাবে একটি লুক্কায়িত জ্যামিতিক কাঠামো বা 'সাব-ভ্যারাইটি' (Geometric subvariety) তৈরি করতে হয়।

একটা উদাহরণ এর মাধ্যমে বিষয়টা সহজ করা যায় , আপনি। একটা দেশের মানচিত্র হাতে নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শহর খুঁজছেন। আপনি দেখলেন, সেই শহরগুলোর অবস্থান মানচিত্রে এলোমেলো না যেমনটা হওয়ার কথা; তারা সবাই একটি সরলরেখা বা একটি নিখুঁত বৃত্তের ওপর অবস্থান করছে।এখন কেন এই নির্দিষ্ট আকার সেটাই প্রমাণ করছে জিমারম্যান । স্পেসের ভেতর লুকিয়ে থাকা সংখ্যাতত্ত্বের ডেটাই এর জ্যামিতিক বিন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট আকার নিতে বাধ্য করছে। জিমারম্যান প্রমাণ করেছেন, ট্রান্সেনডেন্টাল নাম্বার বা তুরীয় সংখ্যাগুলোর (যেমন- পাই বা অয়লারের ধ্রুবক) আচরণের সাথে জ্যামিতিক আকারের একটি সলিড সম্পর্ক রয়েছে। সমীকরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় জ্যামিতিক আকার কেমন হবে, আবার জ্যামিতিক আকার বলে দেয় সমীকরণের ভেতরে থাকা সংখ্যাগুলোর গাণিতিক মান কতটা জটিল হতে পারে।

হোং ওয়াং এবং জ্যাকব জিমারম্যানের কাজ একট বিষয় পরিষ্কার করে যে, বিজ্ঞান (গনিতসহ) এর বিষয়গুলো কতটা একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। গাণিতিক ধারণাগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে নতুন এবং আরও জটিল কাঠামোর জন্ম দিচ্ছে।

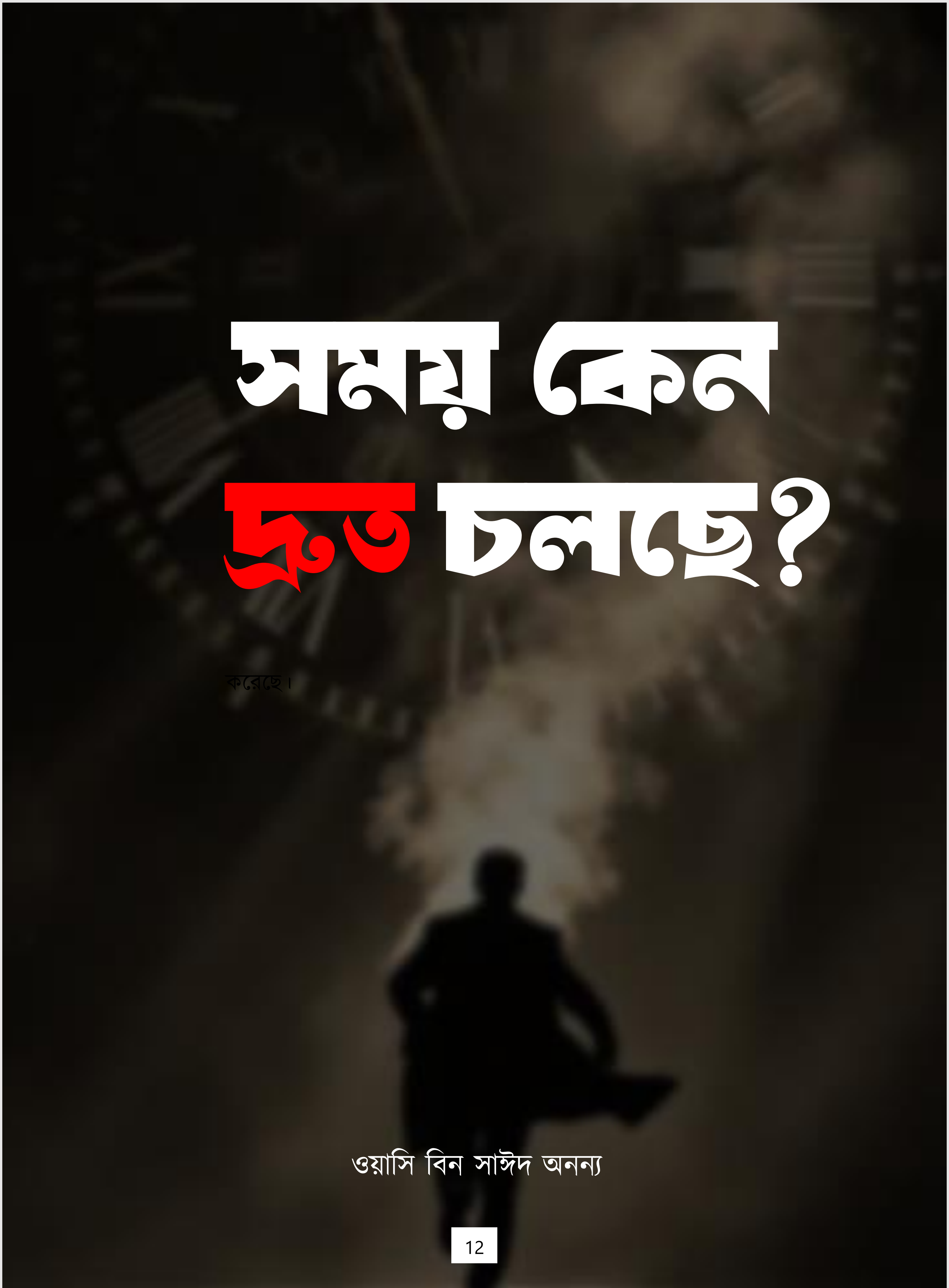

সময় কেন দ্রুত চলছে?

করেছে।

ওয়াসি বিন সাঈদ অনন্য

রাইফ তার ফোনে মেসেজ চেক করল, তার বন্ধু একটি মিম্ পাঠিয়েছে, লেখা “You have successfully wasted 3 months of 2026” একটু হাসল, তারপর চিন্তা করে দেখল। আসলেই ৩টা মাস পার হয়ে গেছে।

আপনার কি মনে আছে করোনা মহামারীতে সারাদেশে কবে লকডাউন দিল? ২০২০ সাল। এটা কিন্তু ২-৩ বছর আগের ঘটনা নয়, পুরো ৬বছর পার হয়ে গেছে। ছয় বছর! এই ছয় বছরে কি কি আসলো? এআই আসলো; একটা বিশ্বকাপ আসলো (আরেকটা খুব শীঘ্রই আসছে); ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ; ন্যাটো বড় হলো; বাংলাদেশ স্টারলিংকের সার্ভিসে চলে গেল; মহান জুলাই বিপ্লব ঘটল; “অ্যাভাটার” এর নতুন মুভি মুক্তি পেল; ‘স্কুইড্ গেম’ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস্’ সিরিজের সমাপ্তি হলো, আরও কত কি। কিন্তু ছয়টা বছর কেন জানি খুব ছোট সময় মনে হচ্ছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের কথা যদি ভাবতে যাই, অনেকের কাছে এখনও মনে হয় বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, কারণ তাদের অনেকেরই শৈশবকাল ২০১৬। সেসময়ের সুন্দর স্মৃতি তাদেরকে এমনভাবে ভাবায় যেন সেদিনই তো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দশটি বছর পার হয়ে গেছে! এই আমলে যদি কেউ বলে, ‘শুধু ৫মিনিট দেখেই ফোনটা রেখে দিচ্ছি’, সেই ৫মিনিট হয়ে যায় ১০মিনিট, একটু স্ক্রল করতে করতে হয় আধঘন্টা, তারপর শর্টস্ দেখতে দেখতে হয়ে যায় ১ঘন্টা। আগে যদি বলা হতো ৫মিনিটে আসছি, কোনো এক বিচিত্র কারণে এখন এই ৫মিনিট আর ৫মিনিট থাকেনা, বেশি হয়ে যায়। ঘন্টা গুলো মিনিটের মতো যাচ্ছে, আর দিনগুলো মাত্র কয়েক ঘন্টা। ২৪ ঘন্টা এখন কমই মনে হয়, অনেকের মন বলে দিনগুলো এত ছোট কেন! ২৪ ঘন্টার বেশি হতে পারেনা?

সময়ের এই দ্রুত চলার পেছনে মতামত আছে অনেক। কেউ বলে মানুষ ধীর হয়েছে, পৃথিবীর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ম্যাট্রিক্সে গ্লিচ, কারও ধারণা মানুষ কোনো নতুন ডিমেনশনে প্রবেশ করেছে, আবার কেউ এটাও মনে করে যে “সিস্টেম” আমাদের সময়ের ধারণাকে ম্যানিপুলেট করে ফেলেছে! বললে অনেক বলা যায়, সাইন্স ফিকশনের অভাব নেই।

পৃথিবীর গতি পরিবর্তনের বিষয়টা সামান্য হলেও সত্য হতে পারে, কারণ ইহা সম্ভব। ১৯৭০ সালের দিকে “এটমিক ক্লক” ব্যবহার করে একটি গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীর গতি অতি সামান্য হ্রাস পাচ্ছে। পারমাণবিক ঘড়িগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে সময় মাপতে পারে, এতে মহাবিশ্বের কোনো ফোর্স প্রভাব রাখেনা। এই গণনাকৃত সময়ের সাথে যখন পৃথিবীর সময়ের তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায় পৃথিবীর সময় সামান্য কম, মিলিসেকেন্ড লেভেলে। এজন্য বিজ্ঞানীরা ৭০এর দশক থেকে এই অল্প সময়ের পার্থক্যের জন্য ১টি লিপ সেকেন্ড যোগ করার সিদ্ধান্ত নেন। এখন পর্যন্ত মোট ২৭টি লিপ সেকেন্ড যোগ হয়েছে। আবার যদি কখনো গতি বেড়ে যায়, তাহলে ১ লিপ সেকেন্ড বিয়োগ করা হয়। এটি করা হয় মূলত ৩০ জুন(অর্ধবছর) অথবা ৩১ ডিসেম্বরে(বছরান্ত)। এভাবে আমরা অজান্তেই ৫৯সেকেন্ডে মিনিট অথবা ৬১সেকেন্ডে মিনিট পার করে আসছি, এই অতি ক্ষুদ্র পার্থক্য সম্পর্কে কম্পিউটার, ফোন, স্মার্ট-ইলেক্ট্রনিক্স সচেতন, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অতটুকু সময় তেমন কোনো পরিবর্তন আনেনা।

আবার এমনও হতে পারে যে, পৃথিবীর বিষুবীয় অঞ্চলে পশুপাখির পরিযাণ, গলন্ত বরফ, ভূমিকম্প- ভরের পূনর্বিন্যাস ঘটিয়ে পৃথিবীর কৌণিক বেগের(এক্ষেত্রে আহ্নিক বেগ) পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এগুলো সম্ভব! কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবর্তন এতটাই ক্ষুদ্র যেন সমুদ্রে এক মগ পানি ঢালা হয়েছে। কোন মানুষটি ন্যানো সেকেন্ড হিসাব করে করে জীবন অতিবাহিত করে?!

কিন্তু এরপরও তো উত্তর পাওয়া যায়নি। কেন সময়কে এতো দ্রুত মনে হয়?

চিন্তা করুন। আপনার সর্বশেষ আনন্দের স্মৃতি, হয়তো কোথাও ঘুরতে গেছেন, হয়তো কোনো খেলায় আপনার টিম জয়লাভ করেছে ইত্যাদি। এরপর একবার চিন্তা করে দেখেন তো এরপরের সময়টা কিভাবে গেছে? এই স্মৃতিটা যত পুরনো হবে, ততো মনে হবে-এরপর তো অনেক দিন পার হয়েছে, বেশ দ্রুতই পার হয়েছে। সময়ের দ্রুত চলার পেছনে একটা অতিপরিচিত থিওরি আছে। একজন ১০ বছর বয়সীর কাছে প্রতিটি বছর তার জীবনের ১০% আর একজন ৪০ বছর বয়সী যুবকের কাছে মাত্র ২.৫%। এভাবে বয়স বাড়লে জীবনের প্রত্যেক বছরের ব্যাপকতা কমতে থাকবে, মনে হবে বছরটা অজান্তেই চলে গেল। কিন্তু এখানে আরও বিষয় আছে। মানুষের ব্রেইনকে যদি আমরা একটি ভিডিও ক্যামেরার সাথে তুলনা করি, অল্পবয়সে এই ক্যামেরার এফপিএস রেট(প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো স্থির চিত্র তুলতে পারে) অনেক বেশি থাকে, আমাদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি তথ্য প্রসেস করতে পারে, তাই প্রতিটি ঘন্টায় অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাথায় আসে। কিন্তু বয়স বাড়লে এই রেট কমে যায়, তখন পূর্বের ন্যায় একই সময়ে সমপরিমাণ তথ্য প্রসেস করতে পারেনা, তাই মনে হয় সময় অনেক দ্রুত চলছে।

এটি একটি এক্সপেরিমেন্টেও দেখা গেছে যে তরুণরা স্টপ্‌ওয়াচে না দেখে প্রায় ঠিকভাবেই ১মিনিট ধারণা করতে পারে, কিন্তু বয়স্কদের কাছে ১মিনিট গেস্ করতে অতিরিক্ত ২০সেকেন্ডও পার হয়ে যায় মাঝে মাঝে! এর কারণ হিসেবে মানুষের ‘নিউরন ফায়ারিং রেট’ বয়সের সাথে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়, ফলে মানুষের মস্তিষ্কের ‘ইন্টার্নাল ক্লকের’ তুলনায় সামগ্রিক সময় দ্রুত লাগে।

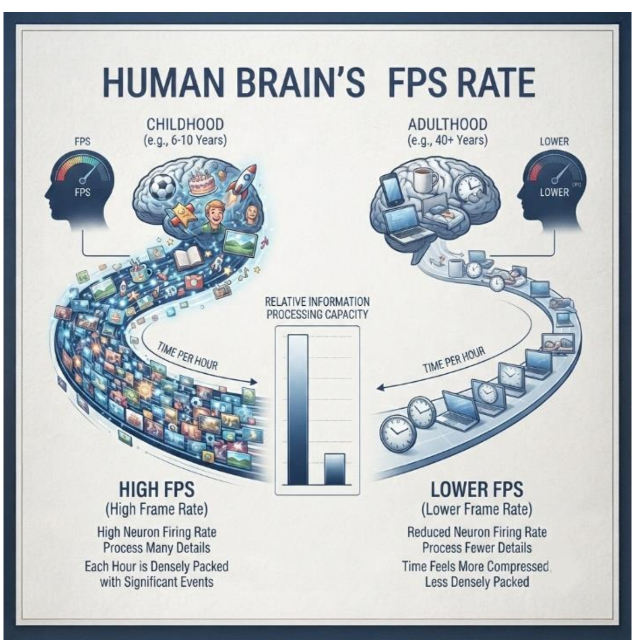

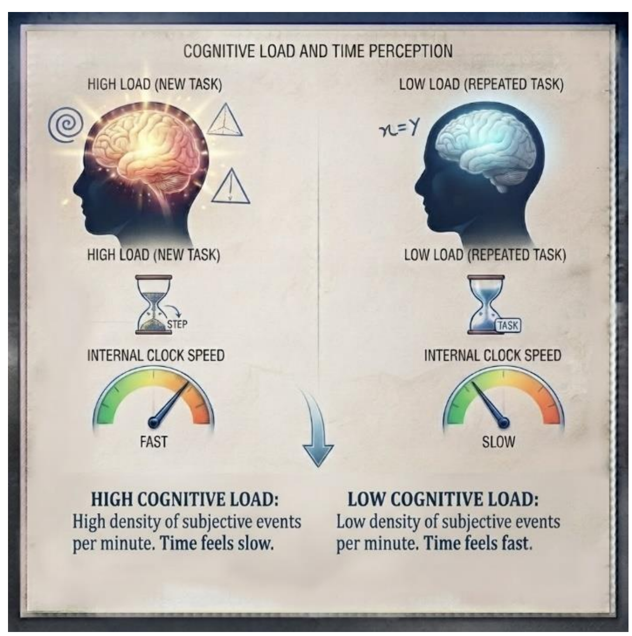

আসলে, সময়ের গতিময়তা বোঝার জন্য মানুষকে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে কতটুকু শক্তি খরচ হচ্ছে তা একটু জানতে হবে। চিন্তা করে দেখুন, আপনি শেষ যে অঙ্কটা করতে অনেক ভেবেছেন, অনেক সময় লেগেছে। আর যে অঙ্ক ২-৩বার আগেই করা হয়েছে কিন্তু করতে যেয়ে আটকে যাওয়ার পর পুনরায় ভেবে সমাধান করতে হয়েছে-এই দুই অঙ্ক সমাধানে একটু পার্থক্য তৈরি হবে। উভয়েই যদি একই সময় লাগে তবুও মনে হবে যে অঙ্কটা নতুন করেছেন, তাতে বেশি সময় লেগেছে। মনে হবে ঐ অঙ্কটা সমাধানের সময় প্রতিটা মুহূর্ত আপনার মাথায় গেঁথে আছে, কোথায় ভুল করেছেন, কোথায় কেটেছেন, সব! মনে হবে সময়টা উল্লেখযোগ্য কাজেই ব্যয় হয়েছে। কিন্তু পূর্বে সমাধান করা যেটা, সেটির ক্ষেত্রে একই সময় লাগলেও মনে হবে সময়টা তাড়াতাড়ি গেছে, তেমন বড় কোনো কিছু ঘটেনাই। আসলে এখানেই সময়ের গতির বিষয়টি আসে। মানুষ ভ্যাকেশনে বেড়াতে গেলে সময়টা আনন্দে কাটে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ভ্যাকেশন শেষ হয়ে গেল মনে হলেও যতবার ঘোরার কথাগুলো মনে করবে, মনে হবে সময়টা স্বাভাবিক গতিতেই গেছে। একজন মানুষ যত বেশি এমন নতুন স্মৃতি তৈরির মধ্য দিয়ে যাবে, ততো নতুন তথ্য, ঘটনা, দৃশ্য, শব্দ সবকিছু প্রসেস করতে মস্তিষ্কে শক্তি বেশি ব্যয় হবে। আর যে কাজ বহুদিন ধরে করছে, নতুন কিছু নয়, এক্ষেত্রে উল্টো। মানুষ তার জীবনে সর্বোচ্চ ‘মস্তিষ্কে শক্তি ব্যয়’ করে ৬-১০বছর বয়সে। এজন্যই এই সময়টা অসীমের ন্যায় মনে হয়। এই বয়সটাতে সবকিছু নতুন শেখে, দেখে, চিন্তা করে, ‘নোটিস’ করে। আর পরবর্তী আবদ্ধ জীবনে মস্তিষ্ককে বেশি করে শক্তি খরচ করতে হয়না, পুনরাবৃত্তির চক্রে সময় কখন পার হয়ে যায় বোঝা কঠিন। স্কুল-কোচিং থেকে এসে স্ক্রলিং, তারপর ঘুম। দিন শেষ! এজন্যই বয়স বাড়লে এফপিএস কমে আর প্রসেসিং ক্ষমতাও কমে যায়।

ছোটবেলায় কখন দুপুরে খেলতে বের হবো! কখন ঈদ, পূজা, জন্মদিন আসবে! কখন মামা বিদেশ থেকে চকলেট নিয়ে আসবে! এই অপেক্ষাগুলো ছিল অকৃত্রিম, সময়গুলো মনে হয় ধীরে গেছে কারণ মানুষ এসময় ‘নোটিস’ করত। এজন্য শৈশবকে মনে হয় একটি ধীর কিন্তু সমৃদ্ধ উপন্যাস আর যৌবনকে মনে হয় দ্রুত পাতা উলটানো গল্প যা পড়াও কঠিন। আইনস্টাইন বলেছিলেন,”চুলোয় ১মিনিট হাত রাখো, মনে হবে এক ঘন্টা; আর এক ঘন্টা একজন সুন্দরী নারীর পাশে বসে থাকো, মনে হবে এক মিনিট” এটাই সময়ের প্যারাডক্স।

সময় সবচেয়ে ধীরে যায় যখন মানুষ ভয় পায়, পোকামাকড় ভয় লাগে এমন একজনের সামনে মাকড়সা রাখলে প্রতি মিনিট তার কাছে দশগুণ বেশি মনে হবে, বিপদে বা ‘ট্রমা’য় থাকলে সময় ধীর মনে হয়, যেন দুঃসময় যাচ্ছেইনা। কিন্তু এজন্য ভয় পেয়ে থাকতে হবে এমন নয়। সময়কে স্বাভাবিক গতিতে উপভোগ করতে চাইলে আমাদের এই আবদ্ধ জীবন থেকে বের হতে হবে। ফোন রেখে আসল জগতের সাথে সম্পৃক্ততা তৈরি করতে হবে, সময়কে কোনোভাবে উপভোগ করতে হবে। তুমি তোমার জীবনে আরও বছর যুক্ত করতে পারবেনা; কিন্তু তোমার বছরগুলোকে আরও জীবনময় করে তুলতে পারবে। বছরগুলোকে ক্যালেন্ডারে হিসাব না করে আমাদের স্মৃতিতে হিসাব করতে হবে। সেনিকা বলেছেন,”জীবন আমাদের কম সময় দেয়না; আমরা নিজেরাই আমাদের দেওয়া সময়ের বেশিরভাগটাই অপচয় করে ফেলি।

“

ভ্যানেরা মিশন

পৃথিবীর যমজ বোনের খোঁজে

সোভিয়েত ইউনিয়ন

অর্পণ সরকার

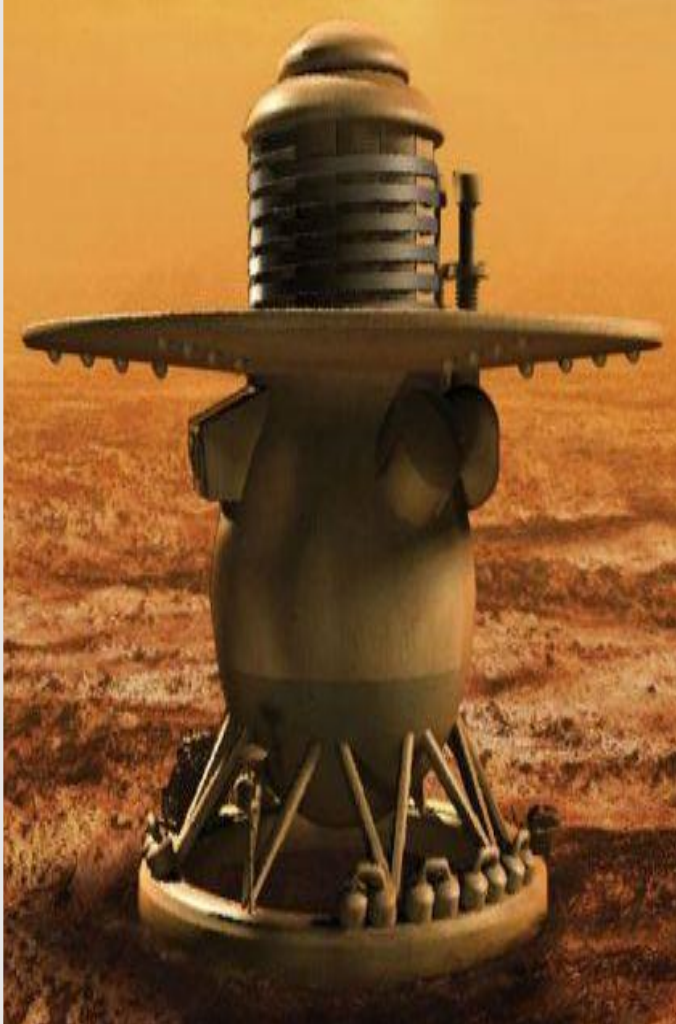

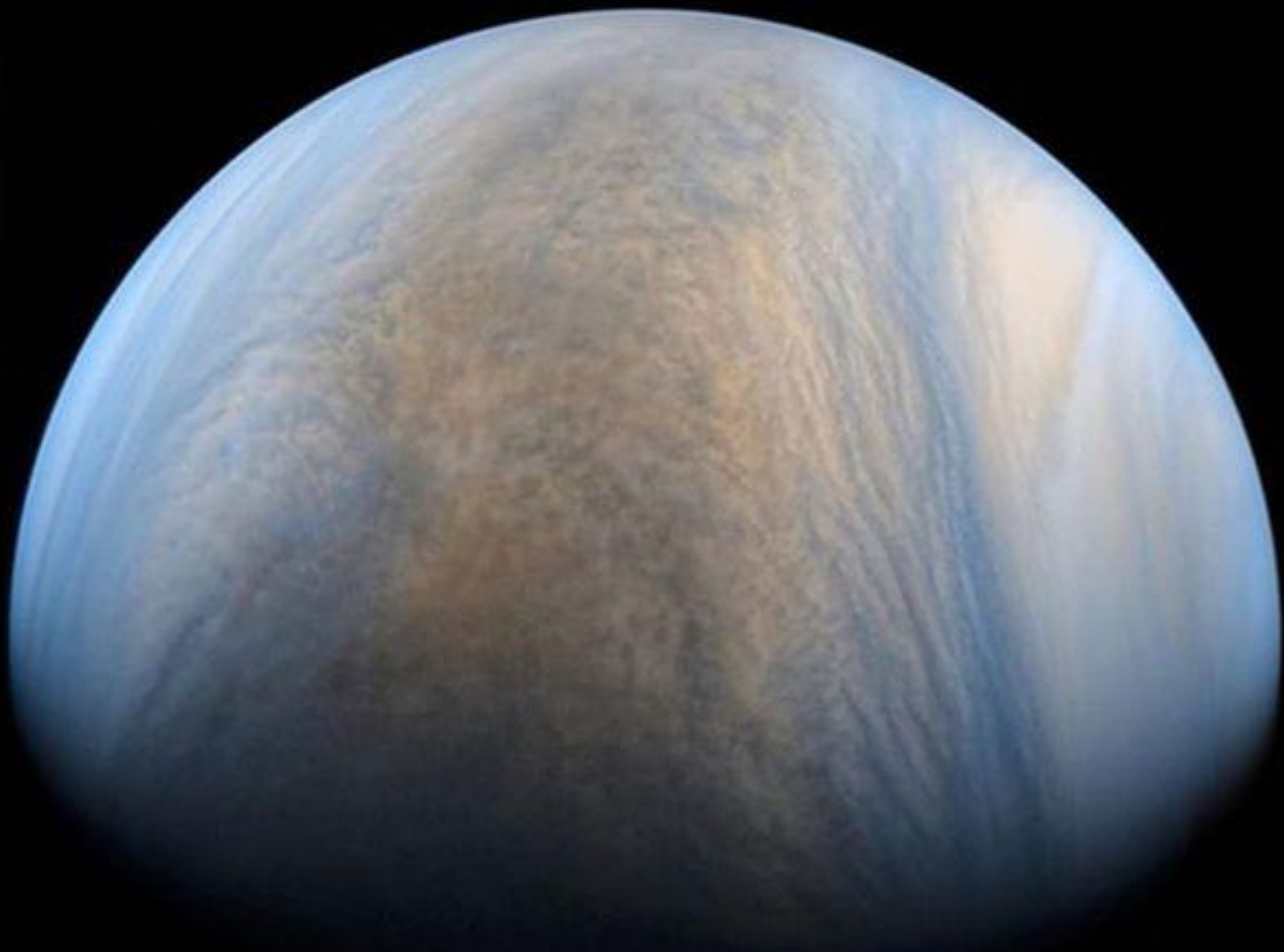

শুকতারা বা ভোরের তারা

আমরা প্রতিদিন ভোরের আকাশে যে উজ্জ্বল তারাটিকে দেখতে পাই, তাকে ভালোবেসে শুকতারা বলে ডাকি। আবার সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে দেখা গেলে একে সন্ধ্যাতারা বলা হয়। কিন্তু এটি আসলে কোনো নক্ষত্র নয়; এটি আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ শুক্র (Venus)।

সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র রাতের আকাশে চাঁদের পরে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। এর কারণ হলো এর ঘন মেঘস্তর, যা সূর্যের আলোর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রতিফলিত করে মহাকাশে ফিরিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা এই বৈশিষ্ট্যকে উচ্চ অ্যালবেডো (High Albedo) বলে থাকেন।

এই উজ্জ্বল গ্রহকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছিল ভেনেরা মিশন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষ করে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে, যখন মানবজাতি প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমা পেরিয়ে মহাকাশ অনুসন্ধান শুরু করে, তখন বিজ্ঞানীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল চাঁদ। চাঁদের পর তাদের দ্বিতীয় পছন্দ ছিল মঙ্গল গ্রহ। কিন্তু রহস্যময়তার কারণে শুক্র গ্রহও তাদের প্রবল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন এর পৃষ্ঠের কোনো মানচিত্র তৈরি করতে পারেননি। কারণ ছিল শুক্রকে ঘিরে থাকা অত্যন্ত ঘন ও স্থায়ী মেঘস্তর। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন, মেঘের নিচে হয়তো রয়েছে বিশাল মহাসাগর, ঘন অরণ্য কিংবা কোনো আদিম জীবনের অস্তিত্ব। এই রহস্যই শুক্রকে মহাকাশ গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য করে তোলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলোতে শুক্র গ্রহকে প্রায়ই পৃথিবীর 'যমজ বোন' (Earth's Twin Sister) বলা হয়। এর কারণগুলো হলো—

1 আকার ও ব্যাস

পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৪২ কিলোমিটার, আর শুক্রের ব্যাস প্রায় ১২,১০৪ কিলোমিটার। অর্থাৎ শুক্রের আকার পৃথিবীর প্রায় ৯৫ শতাংশ।

2 ভর ও ঘনত্ব

শুক্রের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ৮১.৫ শতাংশ এবং এর গড় ঘনত্বও পৃথিবীর কাছাকাছি।

3 মহাকর্ষ

শুক্রের পৃষ্ঠে দাঁড়ালে আপনার ওজন পৃথিবীর তুলনায় মাত্র ৯ শতাংশ কম অনুভূত হবে। এর অভিকর্ষজ ত্বরণ প্রায় ৮.৮৭ মিটার/সেকেন্ড^2।

4 দূরত্ব

সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার, আর শুক্রের দূরত্ব প্রায় ১০৮ মিলিয়ন কিলোমিটার। কক্ষপথের অবস্থানের কারণে যখন পৃথিবী ও শুক্র সবচেয়ে কাছাকাছি আসে, তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র ৩৮ থেকে ৪১ মিলিয়ন কিলোমিটার হয়। ফলে মঙ্গলের তুলনায় শুক্রে পৌঁছাতে কম সময় ও কম জ্বালানি লাগে।

5 সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ সাফল্য

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চলমান স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) মহাকাশ প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়, যা 'স্পেস রেস' নামে পরিচিত।

এই প্রতিযোগিতার শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একের পর এক সাফল্য অর্জন করে—

- ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণ।
- প্রথম জীবন্ত প্রাণী হিসেবে লাইকা নামের কুকুরকে মহাকাশে পাঠানো।
- ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ইউরি গ্যাগারিন-এর মাধ্যমে প্রথম মানুষকে মহাকাশে পাঠানো।

এই ধারাবাহিক সাফল্যের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন শুক্র গ্রহকে লক্ষ্য করে একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি শুরু করে। রোমান প্রেমের দেবী ভেনাস (Venus)-এর নাম অনুসারে এই কর্মসূচির নাম রাখা হয় ভেনেরা (Venera)।

এটি ছিল মানব ইতিহাসে প্রথম সুসংগঠিত মহাকাশ কর্মসূচি, যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডল ও পৃষ্ঠ সরাসরি অনুসন্ধান করা।

6 কার্ল সেগানের তত্ত্ব

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানপ্রচারক কার্ল সেগান শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

তিনি প্রস্তাব করেন যে শুক্রের উজ্জ্বলতার কারণ কেবল মেঘ নয়; বরং এর বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয়ে একটি Runaway Greenhouse Effect সৃষ্টি করেছে।

সেগানের মতে—

- সূর্যের আলো শুক্রে প্রবেশ করে।
- কিন্তু তাপ বিকিরণ আকারে মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না।
- ফলে তাপ ক্রমাগত জমা হয়ে পৃষ্ঠকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তোলে।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে শুক্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মানুষের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং সেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা প্রায় অসম্ভব।

পরবর্তীতে ভেনেরা মিশনের তথ্য সেগানের এই তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণ করে।

ভ্যানেরা-১ (Venera 1): অন্ধকারের বুকে প্রথম পদক্ষেপ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেনেরা-১ উৎক্ষেপণ করে। এটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম মহাকাশযান, যা পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করে অন্য কোনো গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

মহাকাশযানটির ওজন ছিল প্রায় ৬৪৩ কিলোগ্রাম। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুক্র গ্রহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় এর চৌম্বক ক্ষেত্র ও বিকিরণ পরিমাপ করা।

প্রথম দিকে ভেনেরা-১ সফলভাবে তথ্য পাঠালেও পৃথিবী থেকে প্রায় ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পৌঁছানোর পর এর অ্যান্টেনা বিকল হয়ে যায়। ফলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরে এটি শুক্রের প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে অতিক্রম করলেও আর কোনো তথ্য পাঠাতে পারেনি।

এই ব্যর্থতার সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র মেরিনার-২ (Mariner 2) মিশন পরিচালনা করে এবং ১৯৬২ সালে সফলভাবে শুক্র গ্রহের নিকট দিয়ে উড়ে যায়।

মেরিনার-২ প্রথম নিশ্চিতভাবে জানায়—

- শুক্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৪২৫°–৪৫০° সেলসিয়াস।
- সেখানে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র নেই।
- বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণ অত্যন্ত কম।

এভাবেই কার্ল সেগানের গ্রিনহাউস তত্ত্বের প্রথম বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভ্যানেরা-২ (Venera 2): অতিরিক্ত উত্তাপের বলি

১২ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে ভেনেরা-২ উৎক্ষেপণ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এটি শুক্র গ্রহের মাত্র ২৪,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে সফলভাবে অতিক্রম করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, শুক্রের তীব্র তাপ ও বিকিরণের কারণে মহাকাশযানটির তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Thermal Control System) বিকল হয়ে যায়। গ্রহটির নিকটতম অবস্থানে পৌঁছানোর আগেই এর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি অতিরিক্ত উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায় এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফলে ভেনেরা-২ কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠাতে পারেনি।

ভেনেরা-৩ (Venera 3): অন্য গ্রহের বুকে প্রথম মানবসৃষ্ট বস্তু

ভেনেরা-২-এর মাত্র চার দিন পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেনেরা-৩ উৎক্ষেপণ করে।

এবার তাদের লক্ষ্য ছিল আরও বড়। শুধু শুক্রের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া নয়, বরং একটি ল্যান্ডারকে সরাসরি গ্রহটির বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃষ্ঠে অবতরণ করানো।

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ ভেনেরা-৩ শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং গ্রহটির পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে।

এর মাধ্যমে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষের তৈরি কোনো বস্তু পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো গ্রহকে স্পর্শ করে।

তবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় প্রচণ্ড ঘর্ষণ ও তাপের কারণে এর রেডিও ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এটি কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠাতে সক্ষম হয়নি।

ভেনেরা-৪ (Venera 4): নরকের বায়ুমণ্ডলে ৯৩ মিনিট

১২ জুন ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত প্রকৌশলীরা ভেনেরা-৩-এর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভেনেরা-৪ তৈরি করেন।

তারা জানতেন যে শুক্রের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন ও উত্তপ্ত। তাই মহাকাশযানটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে এটি ৪১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ২৫ অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ সহ্য করতে পারে।

ল্যান্ডারের ভেতরে বিশেষ কুলিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছিল, যা উৎক্ষেপণের সময় অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রায় -৮° সেলসিয়াসে নামিয়ে রাখত।

১৯৬৭ সালের ১৮ অক্টোবর ভেনেরা-৪ শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামতে নামতে এটি প্রথমবারের মতো অন্য কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভেতর থেকে সরাসরি তথ্য পাঠাতে শুরু করে।

এর পাঠানো তথ্য অনুযায়ী—

- বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড।
- প্রায় ১.৫% নাইট্রোজেন।
- অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রায় নেই।

কিন্তু নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন ২৫ অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপেই গ্রহের পৃষ্ঠে পৌঁছানো যাবে। বাস্তবে পৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে থাকতেই চাপ সেই সীমা অতিক্রম করে।

ফলে ল্যান্ডারটি প্রচণ্ড চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

তবুও ধ্বংস হওয়ার আগে এটি টানা ৯৩ মিনিট তথ্য পাঠিয়ে মানবজাতিকে শুক্র গ্রহের প্রকৃত পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়।

নাসার মেরিনার-৫ (Mariner 5)

১৪ জুন ১৯৬৭ সালে নাসা মেরিনার-৫ উৎক্ষেপণ করে এবং এটি ১৯ অক্টোবর শুক্রের কাছাকাছি পৌঁছায়।

মেরিনার-৫ সরাসরি কোনো প্রোব নামায়নি। বরং রেডিও অকালটেশন (Radio Occultation) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ও চাপ পরিমাপ করে।

ভেনেরা-৪ এবং মেরিনার-৫-এর তথ্য একত্রে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে—

- শুক্রের পৃষ্ঠের প্রকৃত চাপ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৯০–১০০ গুণ বেশি।
- পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৪৭৫° সেলসিয়াস।

এই আবিষ্কার সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ ল্যান্ডারগুলোর নকশা সম্পূর্ণ বদলে দিতে বাধ্য করে।

ভেনেরা-৫ এবং ভেনেরা-৬

ভেনেরা-৫ (৫ জানুয়ারি ১৯৬৯) এবং ভেনেরা-৬ (১০ জানুয়ারি ১৯৬৯) উৎক্ষেপণ করা হয়।

পূর্ববর্তী তথ্যের ভিত্তিতে ল্যান্ডারগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হয়। এগুলো ৪৫ অ্যাটমোস্ফিয়ার পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারত।

প্যারাসুট ছোট করা হয় যাতে দ্রুত নিচে নামতে পারে এবং ধ্বংস হওয়ার আগে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে দুটি ল্যান্ডারই শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

- ভেনেরা-৫ প্রায় ৫৩ মিনিট তথ্য পাঠায়।
- ভেনেরা-৬ প্রায় ৫১ মিনিট তথ্য পাঠায়।

তারা পৃষ্ঠের খুব কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত চাপে ধ্বংস হয়ে যায়।

তবে তাদের পাঠানো তথ্যের মাধ্যমে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের একটি বিস্তারিত প্রোফাইল তৈরি করা সম্ভব হয়।

ভেনেরা-৭ (Venera 7): ইতিহাসের প্রথম সফল অবতরণ

ভেনেরা-৪, ৫ ও ৬-এর ব্যর্থতা থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে শুক্রে অবতরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রকৌশল প্রয়োজন।

তারা সাবমেরিন প্রযুক্তি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভেনেরা-৭ নির্মাণ করেন।

এর প্রধান অংশটি শক্ত টাইটানিয়াম দিয়ে গোলাকার আকারে তৈরি করা হয়, যাতে এটি—

- ১৮০ অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ,
- ৫৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা

সহ্য করতে পারে।

১৭ আগস্ট ১৯৭০ সালে এটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

নামার সময় প্যারাসুট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ল্যান্ডারটি পরিকল্পনার তুলনায় দ্রুত নিচে নেমে আসে।

তবুও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে ভেনেরা-৭ মানব ইতিহাসের প্রথম মহাকাশযান হিসেবে অন্য কোনো গ্রহের পৃষ্ঠে সফল সফট ল্যান্ডিং সম্পন্ন করে।

প্রথমে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন এটি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে দুর্বল রেডিও সংকেত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এটি আসলে টিকে ছিল।

ভেনেরা-৭ প্রায় ২৩ মিনিট ধরে শুক্রের পৃষ্ঠ থেকে তথ্য পাঠায়।

এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে—

১. শুক্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৪৭৫° সেলসিয়াস।
২. বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রায় ৯০ অ্যাটমোস্ফিয়ার।
৩. পৃষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত, শুষ্ক ও পাথুরে।

এটি মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সাফল্য।

ভেনেরা-৮ (Venera 8): ছবি তোলার আকাঙ্ক্ষা

ভেনেরা-৭-এর সাফল্যের পর বিজ্ঞানীরা শুক্রের পৃষ্ঠের ছবি তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—

শুক্রের ঘন মেঘস্তর ভেদ করে কি সূর্যের আলো পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায়?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ভেনেরা-৮ পাঠানো হয়।

মহাকাশযানটিতে বিশেষ আলো পরিমাপক যন্ত্র (Light Sensor) এবং গ্যাস বিশ্লেষক স্থাপন করা হয়।

২২ জুলাই ১৯৭২ সালে এটি শুক্রের দিনের অংশে সফলভাবে অবতরণ করে।

ভেনেরা-৮ প্রায় ৫০ মিনিট ১১ সেকেন্ড সচল ছিল এবং তথ্য পাঠায়।

এর আলো পরিমাপক যন্ত্র জানায় যে শুক্রের পৃষ্ঠে আলো পৌঁছায়, এবং সেই আলোর মাত্রা পৃথিবীর একটি অত্যন্ত মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের সমান।

অর্থাৎ শুক্রের পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়।

এই তথ্য পাওয়ার পর সোভিয়েত প্রকৌশলীরা প্রথম বিশেষায়িত ভেনাস-ক্যামেরা তৈরি করার কাজ শুরু করেন, যা পরবর্তী ভেনেরা মিশনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

ভেনেরা-৯ (Venera 9): ক্যামেরার চোখে প্রথম নরক দর্শন

ভেনেরা-৮-এর সাফল্যের পর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে এবার শুক্র গ্রহের পৃষ্ঠের প্রকৃত ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে হবে।

৮ জুন ১৯৭৫ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় ভেনেরা-৯। এটি ছিল অত্যন্ত জটিল ও শক্তিশালী একটি মহাকাশযান। পুরো মিশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

- একটি অরবিটার, যা শুক্রের কক্ষপথে ঘুরবে।
- একটি ল্যান্ডার, যা গ্রহের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে।

ল্যান্ডারের ওজন ছিল প্রায় ১,৫৬০ কিলোগ্রাম। এতে বিশেষ প্যানোরামিক ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল, যা ৪৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৯০ অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ সহ্য করতে সক্ষম ছিল।

২২ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে ভেনেরা-৯ সফলভাবে শুক্রের পৃষ্ঠে অবতরণ করে।

অবতরণের মাত্র দুই মিনিট পর এটি ক্যামেরার ঢাকনা খুলে ছবি তোলা শুরু করে। যদিও দুটি ক্যামেরার মধ্যে একটি কাজ করেনি, অন্যটি সফলভাবে ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়।

এর মাধ্যমে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অন্য কোনো গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে তোলা সাদা-কালো প্যানোরামিক ছবি পৃথিবীতে পৌঁছায়।

ছবিগুলোতে দেখা যায়—

- শুক্রের পৃষ্ঠ বালুময় নয়।
- চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঙা ও ধারালো পাথর।
- পাথরগুলোর আকার প্রায় ৩০–৪০ সেন্টিমিটার।

এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের ধারণা দেয় যে শুক্রে হয়তো এখনও আগ্নেয়গিরিগত কার্যকলাপ ঘটছে অথবা অতীতে ঘটেছে।

ভেনেরা-৯ প্রায় ৫৩ মিনিট কাজ করার পর নীরব হয়ে যায়।

ভেনেরা-১০ (Venera 10)

ভেনেরা-৯-এর মাত্র তিন দিন পর, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে ভেনেরা-১০ শুক্রের আরেকটি অঞ্চলে অবতরণ করে।

এটির নকশা ও উদ্দেশ্য ভেনেরা-৯-এর মতোই ছিল।

ভেনেরা-১০ প্রায় ৬৫ মিনিট সচল ছিল এবং অসংখ্য ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠায়।

এর পাঠানো ছবিতে দেখা যায়—

- পাথরগুলো ভেনেরা-৯-এর স্থানের মতো ধারালো নয়।
- বরং এগুলো অপেক্ষাকৃত মসৃণ।
- অনেকগুলো জমাটবাঁধা লাভা থেকে তৈরি ব্যাসল্টিক শিলার মতো।

ভেনেরা-৯ ও ভেনেরা-১০-এর তথ্য একত্রে প্রমাণ করে যে শুক্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি একে অপরের থেকে ভিন্ন।

ভেনেরা-১১ এবং ভেনেরা-১২ (Venera 11 & Venera 12)

১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেনেরা-১১ এবং ভেনেরা-১২ উৎক্ষেপণ করে।

এই দুটি ল্যান্ডারকে আরও উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এর মধ্যে ছিল—

- এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোমিটার,
- রঙিন ক্যামেরা,
- বায়ুমণ্ডলীয় শব্দ রেকর্ড করার জন্য বিশেষ মাইক্রোফোন।

ভেনেরা-১১ প্রায় ৯৫ মিনিট এবং ভেনেরা-১২ প্রায় ১১০ মিনিট সচল ছিল।

এই দীর্ঘ সময়ে তারা শুক্রের বায়ুমণ্ডলে বজ্রপাতের প্রমাণ সংগ্রহ করে।

ল্যান্ডারগুলো বায়ুমণ্ডলে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ শনাক্ত করে, যা নির্দেশ করে যে সালফিউরিক অ্যাসিডের মেঘের মধ্যে নিয়মিত বজ্রঝড় সংঘটিত হয়।

এটি ছিল শুক্রের আবহাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার।

ভেনেরা-১৩ (Venera 13): ভেনেরা সিরিজের মুকুটমণি

অনেক বিজ্ঞানীর মতে ভেনেরা-১৩ ছিল পুরো ভেনেরা কর্মসূচির সবচেয়ে সফল মিশন।

৩০ অক্টোবর ১৯৮১ সালে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

এতে ছিল—

- উন্নত রঙিন ক্যামেরা,
- রোবোটিক ড্রিল,
- অত্যন্ত সংবেদনশীল মাইক্রোফোন,
- শিলা বিশ্লেষণের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

১ মার্চ ১৯৮২ সালে ভেনেরা-১৩ শুক্রের ফিবি রেজিও (Phoebe Regio) অঞ্চলে অবতরণ করে।

যদিও এটি মাত্র ৩২ মিনিট কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, বাস্তবে এটি ১২৭ মিনিট সচল থাকে।

এটি মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুক্র গ্রহের পৃষ্ঠের উচ্চমানের রঙিন ছবি পৃথিবীতে পাঠায়।

ছবিতে দেখা যায়—

- আকাশ হলুদাভ-কমলা রঙের।
- চারপাশের পরিবেশ ঘন কুয়াশার মতো আলোয় ঢাকা।
- পাথরগুলো বাদামি ও ধূসর বর্ণের।

বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেন যে শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডল সূর্যালোকের নীল অংশকে ছেঁকে ফেলে, যার ফলে পুরো পরিবেশ কমলা-হলুদ দেখায়।

প্রথমবারের মতো মাটির নমুনা বিশ্লেষণ:

ভেনেরা-১৩-এর রোবোটিক ড্রিল শুক্রের মাটি ও শিলার নমুনা সংগ্রহ করে।

এরপর নমুনাগুলো ল্যান্ডারের অভ্যন্তরে এনে বিশ্লেষণ করা হয়।

ফলাফলে দেখা যায় যে শিলাগুলো পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে পাওয়া ব্যাসল্টজাতীয় শিলার সঙ্গে মিল রয়েছে।

অন্য গ্রহের প্রথম শব্দ:

ভেনেরা-১৩ মহাকাশ অনুসন্ধানের ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী কাজ করে।

এটি প্রথমবারের মতো অন্য কোনো গ্রহের শব্দ রেকর্ড করে পৃথিবীতে পাঠায়।

রেকর্ডকৃত শব্দগুলোর মধ্যে ছিল—

- শুক্রের বাতাসের গর্জন,
- ড্রিল দিয়ে শিলা কাটার শব্দ।

ভেনেরা-১৪ (Venera 14)

৫ মার্চ ১৯৮২ সালে ভেনেরা-১৪ শুক্রের আরেকটি অঞ্চলে অবতরণ করে।

এটিও রঙিন ছবি এবং ভূতাত্ত্বিক তথ্য পাঠায়।

তবে এই মিশনের সঙ্গে একটি অদ্ভুত ঘটনা জড়িত।

ল্যান্ডারের ক্যামেরার ঢাকনা বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন জায়গায় পড়ে যেখানে মাটির দৃঢ়তা পরিমাপ করার যন্ত্রটি কাজ করার কথা ছিল।

ফলে যন্ত্রটি শুক্রের প্রকৃত মাটি পরীক্ষা করার পরিবর্তে ভুলবশত নিজের ক্যামেরার ঢাকনাকেই পরীক্ষা করে ফেলে।

এর ফলে মাটির দৃঢ়তা সংক্রান্ত তথ্য বাস্তবের তুলনায় ভিন্ন হয়ে যায়।

যদিও ঘটনাটি কিছুটা হাস্যকর ছিল, তবুও ভেনেরা-১৪ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং শুক্রের ভূতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখ

টাইম ট্রাভেল
কাল্পনিক নাকি বাস্তব?
মোঃ তানভীর ইসলাম

মনে করো আজ রাতে তুমি ঘুমালে,ঘুম থেকে উঠে দেখলে শহর বদলে গছে,তোমার বন্ধুদের বয়স বেড়ে গেছে, কিন্তু তোমার বয়স বেড়েছে কেবল এক বছর। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও পদার্থবিজ্ঞান বলে, তা অসম্ভব কিছু নয়।

আমরা মনে করি সময় সবার জন্য একভাবে চলে, কিন্তু তা সত্য নয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার থিওরি অব রিলেটিভিটি তে দেখিয়েছিলেন যে সময় নির্ভর করে গতি আর মাধ্যাকর্ষনের উপর। একে বলা হয় টাইম ডাইলেশন। কারো গতি যদি আলোর বেগের সমান হয়,তাহলে তার জন্য সময় অনেক ধীরে চলবে। ফলে পৃথিবীতে সময় ৫০ বছর কেটে গেলেও তার জন্য সময় কাটবে হয়তো ৫ বা ৬ বছর। শুধু গতি নয়, সময় মাধ্যাকর্ষনের উপরেও নির্ভর করে।

কোনো স্থানে যদি মাধ্যাকর্ষন বল খুব বেশি হয়,তাহলে সেখানে সময় অনেক ধীরে চলবে। একে বলে গ্রাভিটেশনাল টাইম ডাইলেশন। এর উদাহরণে বলা যায় যে,তুমি যদি কোনো বিশাল ভরের বস্তু, যেমন-ব্লাক হোল এর কাছাকাছি থাকো,তাহলে সেখানে মাধ্যাকর্ষন বল এতই বেশি হবে যে স্পেস-টাইম বেকে যাবে। ফলে সেখানে সময় অনেক ধীরে চলবে। তোমার কাটানো এক ঘন্টা হয়তো পৃথিবীর দশ ঘন্টার সমান হবে

এই থিওরিটাই আমরা দেখতে পাই ক্রিস্টোফার নোলান এর ইন্টারস্টেলার সিনেমায়। নায়ক কুপার যখন ব্লাক হোল এর প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষন বলে থাকা একটি গ্রহে পা রাখে তখন সেখানে কাটানো এক ঘন্টা পৃথিবীর সাত বছরের সমান হয়ে যায়। সে যখন পৃথিবীতে ফিরে আসে তখন দেখে তার ছোট মেয়েটি তার থেকে বয়সে বড় হয়ে গেছে।

এটা শুধু সিনেমার গল্পই না,বাস্তবেও এটা ঘটে। এটা ঘটে আমাদের মাথার উপরে থাকা জিপিএস স্যাটেলাইটগুলোতে। সেখানে টাইম ডাইলেশন কাজ করে দুইভাবে;- ১.স্যাটেলাইটগুলো প্রচন্ড গতিতে ঘুরছে, তাই তাদের ঘড়ি প্রতিদিন পৃথিবীর তুলনায় সাত মাইক্রোসেকেন্ড ধীরে চলে। আবার ২.তারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন থেকে দূরে থাকায় তাদের ঘড়ি প্রতিদিন পৃথিবীর থেকে ৪৫ মাইক্রোসেকেন্ড দ্রুত চলে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় পৃথিবীর সাথে তাদের ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় ব্যবধান তৈরি হয়। এই সূক্ষ্ম ব্যবধান সংশোধন করা না হলে আমাদের ব্যবস্থা প্রতিদিন প্রায় ১০ কিমি এর মতো ভুল পথ দেখাতো।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব,কিন্তু অতীতে ফেরা? এখানেই প্রকৃতি আমাদের আটকে দেয় এক রহস্যময় নিয়মে, যার নাম সময়ের একমুখীতা।

একটা কাচের গ্লাস মেঝেতে পড়লে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, কিন্ত ঐ টুকরোগুলো নিজে থেকে জোড়া লেগে কাচের গ্লাসে পরিনত হয় না। পদার্থবিজ্ঞান এর ভাষায় একে বলে এন্ট্রপি। মহাবিশ্বের নিয়ম ই হলো সে সবসময় সাজনো অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে যাবে। সময়ও এই নিয়মের বাইরে নয়। নদী যেমন পাহাড় থেকে সাগড়ের দিকে ধেয়ে চলে,কিন্তু সাগড় থেকে পাহাড়ে যায় না,সময়ও তেমন। অতীতের সব দরজা বন্ধ করে ভবিষ্যতের দিকে ধেয়ে যায়।

যদিও মাঝে মাঝে ওয়ার্ম হোল নামক শর্টকাট এর মধ্য দিয়ে সময়ের সুরঙ্গ পাড়ি দেয়ার কথা ভাবা হয়। সহজ কথায় ওয়ার্ম হোল হলো স্পেস-টাইম এর মধ্য দিয়ে একটি গোপন সুরঙ্গ। একটি কাগজের দুটি প্রান্তে দুটি বিন্দু থাকলে কাগজটিকে ভাজ করে বিন্দু দুটির মাঝখান দিয়ে একটি ফুটো করলে , যে শর্টকাট রাস্তা তৈরি হলো, তাই ওয়ার্মহোল। তাত্ত্বিকভাবে এটি ব্যবহার করে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছানো বা সময়কে পাড়ি দেয়া সম্ভব।

কিন্তু সেখানে বাধা দেয় একটি লজিক যা গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স নামে পরিচিত। তুমি যদি অতীতে গিয়ে এমন কিছু কর, যার ফলে তোমার জন্মই আটকে যায়। তাহলে তোমার জন্মই যদি না হয় তাহলে অতীতে গিয়ে এই কান্ডটা ঘটালো কে? এই প্রশ্নের কারনেই অতীতে ফেরাটা বিজ্ঞানের কাছে এক প্রশ্নচিহ্ন।

তাহলে টাইম ট্রাভেল কি কল্পকাহিনী?

না,পুরোপুরি নয়। ভবিষ্যতে যাওয়া পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব। তবে অতীতে ফেরা এখনো রহস্যময়। হয়ত সময় একমুখী নদীর মতোই, এগোচ্ছে, কিন্তু ফিরে আসে না। আর এই রহস্যটাই সময়কে আকর্ষনীয় করে তোলে।

শেষ প্রশ্ন তোমাদের কাছে, যদি টাইম ট্রাভেল একদিন সম্ভব হয় তুমি কি ফিউচার দেখবে নাকি এন্ট্রপির নিয়ম ভেঙ্গে অতীতে যাবে?

ERROR
CHIMERA
TRAPPED IN
– VOID –
DAMIAN ROYALES
ওয়াসি বিন সাঈদ

আফজালকে দেখে রীতিমতো থমকে দাঁড়ালো ফায়াদ। হওয়াটা স্বাভাবিক, ৩৭ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে আফজাল। প্রচণ্ড রেগে আছে। ফায়াদ ঠিক মনে করতে পারছে না সে এ অবস্থায় কিভাবে আসলো। যতদূর মনে পড়ছে, সে বাসায় ছিল। ওয়াশরুমে ফ্রেশ হওয়ার জন্য গিয়েছিল। হাতমুখ ধুতে ধুতে খেয়াল করলো আয়নার মানুষটির মুখে দাড়ি নেই! শেভ করল কবে? মনে করতে পারছে না।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ। মুখ মুছে এগিয়ে গেল, দরজা খুলে দেখল একটা ১৩-১৪ বছরের কিশোর নীল নীল চোখে ফায়াদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলছে, ”ইওর ফ্রেন্ড টোল্ড মি টু লেট ইউ নো সাম্থিং, হি ওয়ান্টস টু মিট ইউ ইন ফিফটিন মিনিটস।” বাচ্চাটাকে ফায়াদের চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছে না। স্বর্ণকেশী, নীল চোখ, সাদা চামড়া— এমন মানুষ প্রায়ই দেখত যখন সে সুইজারল্যান্ডে থাকত, বয়স তখন ৩২। জীবনের পাঁচটা বছর সেখানে পার করে। কিন্তু সে এগুলোর কিছুই কেন জানি মনে করতে পারছে না।

বাচ্চাটাকে বিদায় দিয়ে স্যুটেড হয়ে বেড়িয়ে পড়ল। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর বিদেশী বাড়িগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছে। একটা বাড়িতে খুব যাওয়া-আসা হতো আগে। এতদিনে তো এই বাড়িতে নিশ্চয়ই নতুন মানুষ এসেছে, নাহলে আলো জ্বলে থাকার কথা না। যা-ই হোক, এইসময়টায় এক কাপ কফি খেতে হবে, নাহলে সারাদিন বিরক্তিতে যাবে। কলোনিটা পরিষ্কার, বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। হাঁটতে হাঁটতে তার পছন্দের কফি শপে পৌঁছে গেল, এক কাপ ক্যাপাচিনো। কফির গরম বাষ্প আর দোকানের অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সত্যিই অনন্য; তাকে বার বার এখানে নিয়ে আসে। কফিশপের মালিককে বহুকাল ধরে চেনে, কিন্তু নামটা মনে পড়ছে না, জোসেফ নাকি জেফরি? হবে কিছু একটা, মনে পড়ছে না।

বিল পে করে ফেরত আসছে বাসায়, আসার পথে ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো— “একটু দেখে আসি এখন কারা থাকে।“ দরজায় নক্ করতেই একটা গলা ভেতর থেকে চিৎকার করে বলল, ”কাম ইন!” ভেতরে ঢুকেই ফায়াদের চোখদুটো বড় হয়ে গেল, ভ্রুযুগল কপালে ওঠা থেকে থামাতে পারল না, যেন সে ভয়ঙ্কর কিছু দেখছে। কিন্তু কোন স্মৃতি মনে করতে পারছে না, আবারও একই অবস্থা। তার সামনে আফজাল বসে আছে, খুবই বিরক্ত সে। ফায়াদ প্রায় দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকল। পুরোই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কথা বলতে চেয়েও পারছে না, খুব চেষ্টা করে বলে উঠল,”আফজাল তুমি বেঁচে আছো!”

সে ডান হাত দিয়ে নিজের গালে একটা মারল। না, সে স্বপ্ন দেখছে না। আফজাল বলল,”হ্যাভ ইউ গন ম্যাড! কি করছ এসব? মাথা খারাপ হলো নাকি?” ফায়াদ নিজেকে সামলে নিল। বুঝল, এখানে পাগলামি করা যাবে না, সে স্বপ্ন দেখছে না, স্বপ্নে ক্যাপাচিনোর সেই অতুলনীয় স্বাদ বোঝার উপায় নেই। বুঝতে পারল তখন সেই বাচ্চাটা কোন বন্ধুর কথা বলেছে, আফজাল ওকে নিয়ে কফি শপে যেত। আফজাল বলা শুরু করল,”কি ব্যাপার? আমাকে দেখে কি হলো তোমার? আমি তো বেঁচেই আছি, মারা গেলাম আবার কবে? তোমার জন্য সে কখন থেকে বসে আছি, ধারণা আছে?”

“আমি অত্যন্ত দুঃখিত বন্ধু, আমার মাথাতেই ছিল না।”

“মাথায় থাকবে কেমনে? কি কি যে করো সারাদিন! পনেরো মিনিটেই ভুলে গেলা! তা তুমি কি একাই গেছলা নাকি?”

“সরি, একটু আগেই আসলাম। তুমি চাইলে আবার যাইতে পারি।”

“কফি খেয়ে এসে আবার যাবা? দরকার নাই, আজকে বাদ দেও, কিন্তু সত্যি তোমার ওপর খুব রাগ লাগছে আজকে!”

“আমার মাথাতেই ছিল না, সরি মাই ফ্রেন্ড।”

“তুমি কি কালকে আবার ভোর পর্যন্ত জাগনা ছিলা নাকি? উল্টাপাল্টা বকছ।“

ফায়াদের কালকের কিছু মনে নেই, তারপরও বলল, “হ্যাঁ, কাজ এখনও শেষ হয়নাই, আরও চার-পাঁচ পেজ বাকি।” ফায়াদ কোনো আর্টিকেলে কাজ করছে—এই ভান করল।

আফজাল বলল,“বুঝছি।”

“একটু বসো, আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি।“

“ওকে।”

ওয়াশরুমে যেয়েই জোরে দরজা বন্ধ করে দিল, ফায়াদের হাত কাঁপছে। কিভাবে সম্ভব? আফজালের সাথে সে কথা বলছে কেমনে? এই বাসায় আফজাল কেন? সে না মারা গেছে ৪ বছর আগেই? সে নিজ চোখে দেখেছে। ফায়াদ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, পকেটে ইনহেলারটা নিতে ভুলে গেছে। কি করবে বুঝছে না। কিন্তু এটা কে? আর সুইজারল্যান্ডে ফায়াদ এলোই বা কেমনে? অনেক প্রশ্ন মাথায় একসাথে ঘুরছে, ঘেমে যাচ্ছে শরীর। “আমি কি সত্যিই পাগল? নাকি এই মহাবিশ্ব আমার সাথে কোনো নিষ্ঠুর খেলা খেলছে?"

ওয়াশরুমে কাপড় রাখার একটা শক্ত র‍্যাকে বসে পড়ল, নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। শুনশান নীরবতা, কানে একটাই শব্দ আসছে। ট্যাপ থেকে পানি পড়ছে। পাইপের দিকে তাকাতে আবার বিস্মিত, চিন্তা করছে কফিটায় কিছু মেশানো হয়েছে কিনা, সে এগুলো কি দেখছে? আফজালের ওয়াশরুমের পাইপগুলো ট্রান্সপারেন্ট, ভেতরে পানির প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে পানির ফোঁটা নিচে পড়ার কথা, সে দেখছে ফোঁটা উল্টো উপরের দিকে উঠছে, পাইপের শীর্ষে পৌঁছায় টপ টপ শব্দ হচ্ছে। এগুলো দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে র‍্যাক থেকে পিছাতে পিছাতে পড়ে গেল মেঝেতে।

আফজাল বাইর থেকে ডাকল, “কি ব্যাপার? ভেতরে সব ঠিকঠাক তো?”

“হ্যাঁ, তোমার র‍্যাকটা পা লেগে পড়ে গেছে, সরি ম্যান।“

কি চলছে কিছুই বুঝছে না ফায়াদ, সে এটা কোথায় আসল? কি হচ্ছে এসব? এটা তার অতীত, বুঝতে পারল। কিন্তু এখানে কিভাবে ফেরত আসল? স্বপ্ন? ইম্পসিবল! এতটা নিখুঁত হবে না! আবার দেখছে পানি অভিকর্ষের

উল্টোদিকে যাচ্ছে। কি একটা পরিস্থিতি! তার জীবদ্দশায় এমন একবার হয়েছিল; তার ছোট বোন মারা যাওয়ার পর কয়েক মাস সে এমন উদ্ভট জিনিসপত্র দেখত। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হতো পানির ওপর দিয়ে হাঁটছে, গাড়ি চালালে মনে হতো দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, রাস্তার গাছপালা, ল্যাম্প-পোস্ট বেঁকে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হতো আকাশ তার ওপর এসে পড়বে। থেরাপিস্ট দেখানোর পর ঠিক হয়েছে।

বাবা-মা এক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর ফাহমিদা ছিল তার একমাত্র পরিবার, মামা-চাচারা টাকার ব্যবস্থা করেছিল, বাবার চাকরি থেকেও কিছু জমানো ছিল। যদিও ১৮ বছর বয়সী একটা ছেলে তার ১২ বছরের ছোটবোনকে নিয়ে এ পর্যায়ে পৌঁছাবে কেউ ভাবেনি। পড়াশুনা শেষ করে বিদেশে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে জয়েন করে, এরপর বহু দেশ ঘোরার সুযোগ হয়। কিন্তু তার বোন বেশিদিন বাঁচল না। তারপর থেকে সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু এতদিন পর এই মানসিক সমস্যা আবার হচ্ছে কেন? এমন উল্টোপাল্টা কেন দেখছে?

সে বের হয়ে আফজালকে বলল,”এটা কোন সাল?”

আফজাল এই কথায় প্রথমে হাসতে চাইল, পরে ভাবল ওর বন্ধু কি আসলেই পাগল হলো নাকি? বলল,”তুমি ঠিকঠাক তো? আর ইউ হাই?”

সোফায় বসে পড়ল ফায়াদ। “আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে পারবা?”

“ওয়েট আ সেক, আমি জুস আনছি।”

ফায়াদ বসে বসে অতীত স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছে, পারছে না। যেন একটা ব্যারিয়ারে আটকা পড়েছে, তার শুধু যতটুকু জানার অ্যাক্সেস আছে, অতীতের ততটুকুই মনে করতে পারছে। পাশে দেখতে পেল একটা কাগজে কি যেন লেখা। কাগজটা হাতে নিল, একটা ম্যাথ প্রবলেম। কাগজের নিচে তার পছন্দের শিল্পীর একটা গানের কিছু লাইন— “উই আর ফ্রি! উই আর ফ্রি! দিস ইজ নট আ ড্রিম! বাট ইট শিওর ফিল্স লাইক ওয়ান!...”

আফজাল বোঝার চেষ্টা করছে, এরকম একটা সময় এই কাগজে এটা কেন লেখা? তার অবস্থার সাথে কিভাবে মিলল? এটা কি কোনো মেসেজ বা ধাঁধা? এটা কোন জগতে এসেছে সে? ম্যাথ সল্ভ করা শুরু করল। এরমধ্যে আফজাল জুস নিয়ে এসেছে, তাকে অঙ্ক করায় ব্যস্ত দেখে আর কিছু বলল না।

৭-৮ মিনিট পর সে দেখল উত্তরটা খুব পরিচিত। তার জন্মদিন! ১২০৯, ১২ই সেপ্টেম্বর। সাহারা তাকে একটা কলম উপহার দিয়েছিল। সে কলম এখনও পকেটে থাকে। খেয়াল করে দেখল সেই কলমই তার হাতে, ওটা দিয়েই অঙ্কটা সলভ করল। পুরনো দিনের কথা মনে করে ভালো লাগছে। এখন স্বাভাবিক লাগছে, পুরনো স্মৃতি একটা হলেও মনে পড়েছে! সে জুসটা খেয়ে বাসায় যেতে চাইল।

আফজাল বলল,”রাতে বের হলে কল দিও। তোমাকে তো কল দিলে পাওয়া যায় না।”

বলে যখনই হাত মিলাতে যাবে, তার দৃষ্টি ছোট হয়ে আসল, সব হঠাৎ কালো হয়ে গেল। গমনকালে নভোচারীরা যেমন নাইন-জি অনুভব করে, ঠিক একইরকম চাপ অনুভব করতে থাকল, সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। হাত মিলানো আর হলো না। কি হলো? হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? বুঝতে পারল না ফায়াদ।

১.

বাচ্চারা খুব চ্যাঁচামেচি করছে। ফায়াদের মাথায় একটা হালকা বারি মারল রুমন। ফায়াদ জেগে উঠল। "কিরে, ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘুমায় গেছলি নাকি?" ফায়াদ চোখ মুছে দেখল সে একটা স্কুল মাঠে বসে আছে। তার শৈশবের বন্ধু রুমন, হাতে ২টা জুসের বোতল। একটা ফায়াদকে দিয়ে বসে পড়ল। ফায়াদ ওকে দেখে এবার চমকে উঠেনি। বুঝল এটা নতুন টাইমলাইন; রুমনের বয়স যদি এই টাইমলাইনে ১৫-১৬ হয়, তারও নিশ্চয়ই ১৫-১৬। সে আরও অতীতে চলে এসেছে। ওরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাইরে এসেছে। এই সময়টা খুব সুন্দর ছিল। তার পুরো পরিবার তখনও জীবিত। সারাদিন খেলাধুলা করত। স্কুলে গেলে শুধু মহিউদ্দিন স্যারের ক্লাস ছাড়া আর কারও ক্লাস করতে পছন্দ করত না। জুস খেতে খেতে রুমনের দিকে তাকাল। কত ছোট লাগছে! ওকে দেখে নিজেরও চেহারাটা দেখতে ইচ্ছা করছে। তখন বেশ স্বাস্থ্যবান ছিল ফায়াদ। রুমন বলে উঠল,"কিরে হোমওয়ার্ক করছিস?" তুই তো স্যারের ক্লাস মিস দিবিনা। কতগুলা অঙ্ক দিছে! তুই করে থাকলে দে তো, আমি কপি করব, কালকে করতে পাইনাই।" এই মুহূর্তে ফায়াদ নিজেও জানে না আসলে করেছে কিনা, করার তো কথা, সবসময় করত। ব্যাগে হাত দিয়ে খাতাটা বের করল, সাথে একটা কুপনও বের হলো। ফায়াদ খাতাটা দিয়ে বলল,"খাতায় অঙ্ক করা আছে, করতে থাক, আমি পরের পিরিয়ডে আসব।"

"কেন কই যাস?"

"আসতেছি, ফাহমিদার কাছে আমার টিফিনবক্সটা নিয়ে আসতেছি।" ফায়াদ আসলে ফাহমিদার কাছে যাচ্ছে না, মিথ্যা বলেছে। সে একটা শপে যাচ্ছে। কুপনটা দিয়ে কিছু কেনা যায় কিনা দেখতে, যদিও কুপন অনেক আগেই এক্সপায়ার্ড। আসলে সে যাচ্ছে কারও সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। দোকানের সামনে পৌঁছে দেখল বাজে ১১টা ২৩, দেরি হয়ে গেছে! ফেরত যাচ্ছে স্কুলের দিকে, সে ব্যর্থ। যাওয়ার পথে একটা বিষয় চোখে পড়ল, তার পায়ের নিচে কোনো ছায়া নেই! সবার ছায়া আছে, তার নেই। আবার শুরু হলো এমন ঘটনা। আশেপাশে তাকাচ্ছে, সে আসার সময়েই একটা প্যাটার্ন খেয়াল করেছে। কয়েকটা দোকানের ব্যানারে দেখল কিছু শব্দ হলুদে লেখা, অন্য সব শব্দ আলাদা রঙের, শুধু ঐ কয়েকটাই হলুদ। "থিংক" "কিপ থিঙ্কিং" "থিংক উইথ ইওর কনশেন্স" "থিংক উইথ ইওর মাইন্ড"। এমন যেন ওর জন্য কেউ সেগুলো মার্ক করে দিয়েছে। সব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, আজব কাউকে দেখেনি। কিন্তু তার চোখেই কেন এগুলো ধরা পড়ছে? এগুলো কিসের সংকেত? সে কেন এভাবে অতীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? প্রশ্নের উত্তর মিলল না। স্কুলে পৌঁছায় দেখে রুমন ক্লাসের বাইরে অপেক্ষা করছে। ক্লাসে ঢুকল দুজনই। বসে পড়ল বেঞ্চে, এখন মহিউদ্দিন স্যার আসবে। তিনি ঠিক ৬২ বছর বয়সে মারা যান, ফায়াদ তার জানাজায় গিয়েছিল। এই তথ্যটা তাকে এখন দিলে কি হবে? তার কেমন লাগবে এটা শুনতে? তাহলে কি ভবিষ্যৎ বদলাবে? ফায়াদ ভাবছে। স্যারের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এখনই প্রবেশ করবে রুমে, আর সাথে সাথে আবারও

দৃষ্টি ছোট হয়ে আসতে লাগল ফায়াদের, দেখতে পাচ্ছে না, কিছু শুনতেও পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখনই পড়ে যাবে, তাকে কি কেউ ধরবে? পেছনে বেঞ্চ আছে, মনে হয় পড়ে যাবে না। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসল। কেন হলো? জানে না সে।

২.

অ্যালার্ম বাজছে। সকাল ৬টা, চোখ খুলে দেখল সূর্যের প্রখর আলোয় ফায়াদের রুম আলোকিত। অনেক গরম লাগছে। পাশে একটা ক্যালেন্ডার। সে এবার **১৩** বছর পিছিয়েছে। সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার আগে সে কাতারে থাকত। গ্রীষ্ম চলছে। বিছানা থেকে উঠে ব্যালকনিতে গেল। গরম হলেও বেশ সুন্দর লাগছে দিনটা। ফায়াদের সূর্যের আলো ভালোই লাগে, আলোকিত দিন খুব সুন্দর। পোশাক পরতে পরতে মনে করার চেষ্টা করছে এবার তার অ্যাক্সেস কতদূর। এতক্ষণ যা ঘটল, সেটুকু ছাড়া সে শুধু মনে করতে পারল- আজকে তার একটা মিটিং আছে, অ্যাটেন্ড করতেই হবে! এসময়টায় তার বোন বেঁচে আছে, আফজালও বেঁচে আছে, কাতারেই আছে, একই বিল্ডিংয়েও। যদিও আজকে কেবল রাতে কফি খেতে যাওয়া ছাড়া দেখা হবে না, তবে ফাহমিদার সাথে লাঞ্চ করবে, ফাহমিদার সাথে দেখা হবে। কেন জানি তার মনে এসবকিছুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে আরেকজন মানুষকে খুঁজে বের করা। সে কি এই টাইমলাইনে আছে? ফাহমিদার সাথে দেখা করতে চায় না ফায়াদ। কারণ আছে, সে ঐদিনের পর থেকে নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। যেদিন মারা যায় ফাহমিদা, সেদিন সকালে কথাও হয়নি ওর সাথে। সর্বশেষ দেখেছিল লাল জামায়, জামার রঙ লাল নয়, লাল হয়ে গিয়েছিল। এই স্মৃতিটা মনে করতে পারল কিভাবে?

এটার অ্যাক্সেস আছে মনে হচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে কাইমেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সামনে নামল। অফিসের মানুষগুলোর সাথে আগে কি ভালো সম্পর্কই ছিল! কিন্তু নাম মনে পড়ছে না। শুধু মি. আহমাদের নাম মনে আছে। উনি হেড অফ দ্য গভর্নিং কমিটি। মিটিংয়ের মাঝে চোখে পড়ল ফায়াদের সামনে রাখা গ্লাসে। পানিতে ছোট ঢেউ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সামান্য ডিলে-তে। এতক্ষণে পাশের লোকটার নাম শুনে ফেলেছে ফায়াদ, 'অ্যাডাম লিভাইন'। সে হালকা পা নাড়াচ্ছে, কাপের পানিকে আন্দোলিত করার জন্য উপযোগী শক্তি আছে ঐ নড়াচড়ায়। কিন্তু সে যখনই নাড়াচ্ছে, তার প্রায় ২ সেকেন্ড পর পর পানি আন্দোলিত হচ্ছে। ফায়াদ ভুল দেখছে না। নিজেও একবার গ্লাসটা সরিয়ে দেখল, পুরো ২ সেকেন্ড কিছুই নড়ল না, তারপর ঠিক যেভাবে নড়িয়েছে, সেভাবে নড়ে উঠল, কিছুটা পড়ে গেল টেবিলের ওপর। কয়েকজন তাকাল। একজন বলে উঠল,"মি. ফায়াদ? এভরিথিং গুড?" ফায়াদ তার চারপাশে কোনো কিছুকেই আর গুরুত্ব দিচ্ছে না। কে কি বলে বলুক। অলরেডি একটা লেখাও চোখে পড়েছে। মিটিংরুমের চারকোণায় চারটা ফুলদানি দেখেছিল। প্রত্যেকটার আকৃতি খুব সিম্পল, একটা পারফেক্ট সার্কেল, একটা পারফেক্ট কিউব, পারফেক্ট কোণক এবং পারফেক্ট পিরামিড। এতক্ষণে এই জগতের নিয়মগুলো তার মাথায় ঢুকে গেছে। প্রথমে সব স্বাভাবিক যায়, তারপর একটা আজব কিছু ঘটতে দেখে, যা স্বাভাবিক ল'স অফ ফিজিক্স মানে না। আর এরপরে তাকে একটা মেসেজ খুঁজে বের করতে হয়, ওটা খুঁজে পেলে সে সবশেষে একটা রিডল সল্ভ করতে পারলে আবার নতুন মেমরির অ্যাক্সেস আসে। সে এবার বেশ মজাই পাচ্ছে। ধরে ফেলেছে এই আজব সিস্টেমের কারসাজি। ফায়াদের মুখে সামান্য হাসি, আশপাশের লোকজন তাকে দেখে বিস্মিত! ফায়াদ কেন জানি কথা বলছে

না, হাসছে কেন এভাবে? পাগল-টাগল হলো নাকি? ফায়াদ টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল। কাউকে গুরুত্ব না দিয়ে তার গ্লাসটি উপরে ছুঁড়ে মারল। সে দেখছে গ্লাসটা হাওয়ায় ঘুরছে কিন্তু কোনো পানিই পড়ছে না। গ্লাসটা পড়ে গেল টেবিলের ওপর। ঠিক ২ সেকেন্ড গুনার পর দেখে অ্যাডামের শার্ট ভিজে গেছে আর টেবিলের ওপর পানি ছড়িয়ে গেছে। তার মানে যা ঘটে, কেবল সে-ই দেরি দেখে। মি. আহমাদ বলে উঠল,"হোয়াট কাইন্ড অফ ননসেন্স ইজ দিস? হোয়াট আর ইউ ডুইং!?" ফায়াদ গুরুত্ব দিল না। সে হাসতে হাসতে টেবিল থেকে উঠল। আসার সময় তাকে পাশের রেস্তোরাঁ থেকে একটা লিফলেট দিয়েছিল। ৪টা আকৃতিতে তাদের মেনুটি সাজানো ছিল। ৪টা আকৃতির সন্ধান পেয়ে গেছে। রুমের চার কোণায় চারটা ফুলদানির সামনে স্টিকি নোটস লাগানো ছিল। সে সেগুলো একটা একটা করে জোগাড় করল আর বাকিরা তার কাণ্ড দেখছে।

একজন ইতোমধ্যে আফজালকে কল করেছে, তার বন্ধু পাগল হয়ে গেছে জানানোর জন্য। কিন্তু আফজাল এখন ফোন ধরতে পারবে না। তার দুহাত আকাশে তোলা, চোখে ভয়। কোনো কাজে ব্যস্ত নয়, কল ধরাই যাবে না, ও বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। "আমার কাছে অতো টাকা নেই, আমি কিভাবে দেব?" কালো মুখোশ পরা লোকটা বলল,"তা আমাদের জানার বিষয় নয়, যেভাবেই হোক, লাগবে।"

বেশ কয়েকদিন থেকে এই গ্যাং আফজালকে টার্গেট করেছিল। অন্যদেশের তো, ভেবেছে বন্দুকের ভয় দেখায় যা আছে কেড়ে নেবে, বেশ মোটা অঙ্কের স্যালারি পায়! আফজাল এই মুহূর্তে জীবন বাঁচাতে ভয়ে যা-তা বলতে পারে! ওর চেয়ে ফায়াদের ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক বেশি। বলবে নাকি ফায়াদের নাম? ওকে ধরলে আরও বেশি পাবে? কিন্তু নিজের বন্ধুকে এভাবে রিভিল করবে? কিন্তু ভয়ে মাথা কাজ করছে না। কখন জানি শুট করে! সে ভয়ে বলে ফেলল,"আমার বন্ধুর ব্যাংকে থার্টি থাউজেন্ড ডলার আছে! আমাকে প্লিজ মেরো না! ওর ক্রেডিট কার্ড ওর বোনের কাছে থাকে। কার্ডের সাথে লাগানো স্টিকারেই পিন আছে! আমাকে মেরো না!" আফজাল কিছুক্ষণ থেমে চিন্তা করে দেখল সে সব বলে দিয়েছে, আর লুকানোর উপায় নেই। এই ডাকাতগুলো ফায়াদকেও চিনত, ওর বোনকেও, আফজালকেও, তারা কোথায় লাঞ্চ করত, কোথায় থাকত সব জানা। তাই আজ সুযোগ পেয়ে ধরেছে। কিন্তু একসাথে এতগুলো টাকা ফায়াদের ব্যাংকে থাকবে- ভাবেনি। আফজালকে কোনোমতে ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর ফোন নিয়েছে আর ওকে নেইমু রেস্তোরাঁর আশেপাশে যেন না থাকে, সে হুমকি দিয়েছে। আফজাল ভয়ে কি করবে বুঝছে না। ওরা কি ফাহমিদাকে অ্যাটাক করবে? কি করবে ও? কিছুই মাথায় আসছে না।

অন্যদিকে, আফজাল যে চারটা নোট পেয়েছিল সেগুলোতে আলাদা আলাদা করে লেখা "হেয়ার মাই", "থটস", "ইন এভরি", "নোট"। সে নোটগুলো উল্টে দেখল, আর কিছুই লেখা নেই। এটাই কি তার রিডল? এখন কি করবে? বুঝছে না। ততক্ষণে লাঞ্চ টাইম হয়ে এসেছে, মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে, কাউকে তোয়াক্কা না করেই। যাচ্ছে নেইমু রেস্তোরাঁর দিকে। ট্যাক্সি চলতে চলতে রাস্তার মাঝখানে থেমে গেল। অনেক ভিড়, সামনে কিছু হয়েছে।

ট্যাক্সিতে ২ মিনিট অপেক্ষা করার পর বের হলো। আগাচ্ছে স্পটের দিকে, খুবই অপ্রস্তুত ছিল। কেন? কেন তাকে এই জগৎ এই দিনটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসল? ফাহমিদাকে অ্যাম্বুলেন্সে নেওয়া হচ্ছে। চারপাশে ভিড়, ফায়াদের চোখে পানি আসতে চাচ্ছে, কিন্তু আসছে না। বুঝছে না কেন। ধীরে ধীরে আগাতে লাগল, যেন আশেপাশের কোনো শব্দই

তার কানে আসছে না। গুলি করার পর রক্তে লাল হয়ে গেছে জামা। আরেকবার ফাহমিদাকে দেখতে মন চাচ্ছে, কিন্তু দেখে কি করবে? সে যে মারাই গেছে, আবার মারা গেল, এবারও কিছু করতে পারল না। তাকে এই দিনটায় ফিরে আসতে হলো কেন! ড্রেসারের দিকে আগাতে আগাতে ফাহমিদার মুখটা যখনই স্পষ্ট হতে লাগল, আবার একই অনুভূতি। অন্ধকার হয়ে আসল সবকিছুই, আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছিল রাস্তায় পড়ে গেল, চোখ পানিতে ভেজা।

৩.

চার বছর পিছিয়েছে। গতকাল আফজাল মারা গিয়েছিল -এই দিনটায় ফেরত এসেছে। তার মনে আছে সে আফজালের মৃত্যুর পর ৩ দিন অফিস যায়নি, বাড়ি থেকে বেরও হয়নি। আজ সেই ৩ দিনের প্রথম দিন। বসে আছে সোফায়। ফায়াদের আর ভালো লাগছে না। কোনো ধাঁধাঁ খুঁজতে ইচ্ছে করছে না। বসে বসে এই জগতের এই উদ্ভট জিনিসগুলোর জন্য নাম ভাবতে থাকল। প্রতিবার এক টাইমলাইন থেকে অন্য টাইমলাইনে গমন করা-এর নাম বের করল ‘হাইপার শিফট’। এরপর যে আজব ঘটনাগুলো ঘটছে, তার নাম দিল ‘এরোর’; যে মেসেজগুলো পাচ্ছে, তার নাম ‘কোড’ আর ধাঁধাঁগুলো ‘রিডল’। নিজের দেওয়া নামগুলো শুনে হালকা হাসি পাচ্ছে। এবার সে কিছু করবে না, করার মতোও তেমন কিছু নেই, এ টাইমলাইনে কাছের কেউ নেই। যাকে খুঁজছিল সে-ও নেই। বাইরে পাখি ডাকছে, কলোনির লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বসে বসে অপেক্ষা করছে, এভাবে থাকতে থাকতে এক ঘণ্টা হয়ে গেল, কিছুই হয়নি, বিরক্ত লাগছে অপেক্ষা করতে করতে। কারেন্ট চলে গেল, তার রুমে পর্দা বাইরের আলো ঢেকে রেখেছে, কিন্তু অন্ধকারই ভালো লাগছে, পর্দা সরাতে মন চাচ্ছে না। সে আগে খুব গান শুনত। তার একটা ব্যাটারিচালিত সিডি প্লেয়ার আর অনেকগুলো গানের অ্যালবাম ছিল, এখানেই থাকার কথা। বসে থাকতে থাকতে আরও এক ঘণ্টা পার হলো, কোনো কিছুই হচ্ছে না, সাড়া শব্দ নেই। হ্যাঁ? শব্দ নেই? একটু আগেই না পাখি ডাকছিল? মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, ফায়াদ ভাবতে ভাবতে উঠে জানালার কাছে পর্দা সরিয়ে দেখে পাখি-মানুষ ঠিকই আছে, অথচ শব্দ নেই। এরোর পেয়ে গেল নাকি? একটা কলম মেঝেতে ফেলল, কোনো শব্দ নেই; জানালার কাচে হাত দিয়ে আঘাত করল, কোনো শব্দ নেই। এটাই এরোর! সে নিশ্চিত। গানের অ্যালবামের কথা যেহেতু হঠাৎ মনে পড়েছে, নিশ্চয়ই ওখানে কিছু আছে। সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খুঁজতে লাগল তার সিডির কালেকশন, খুঁজতে খুঁজতে একটা অ্যালবাম পেল যার নাম ‘ট্র্যাপ্ড ইন ভয়েড বাই ডেমিয়ান রয়েল্স’। নামটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে। সিডি প্লেয়ারে গান ছেড়ে দিল। গানের প্রত্যেকটা লিরিক্স খেয়াল করছে।

“আই অ্যাম সো টায়ার্ড, আই ওয়ানা গো ব্যাক,

ইজ দিস দ্য মিরর এক্সিট? আইম সার্চিং ইন দ্য ডার্ক”

একদম মিলে গেছে! সে দেরি না করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আজব বিষয় আয়নায় শুধু মোমবাতির প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে, ফায়াদের প্রতিবিম্ব নেই। সে জানে কিছু একটা হবে, তাই অপেক্ষা করছে আর ওদিকে সিডিপ্লেয়ার বাজছে। হঠাৎ দেখল, আয়নার ভেতর তার মায়ের প্রতিবিম্ব। সে চমকে উঠল। আস্তে করে বলল,

"আম্মা?" কোনো কথা নেই, তার মায়ের ছবি মিশে যেতে যেতে তার বাবার ছবি। সে বুঝছে না কি হচ্ছে। এরপর ফাহমিদা, আফজাল আরও অনেকের ছবি আসতে থাকল, ফায়াদের অতীতের পরিচিত ও কাছের মানুষ। ফায়াদের ভালোই লাগছে, সে অপেক্ষা করছিল একটা ছবির জন্য, সেটিও আসল। এরপর একে একে কলিগ, বন্ধু, আত্মীয় সবাই আসছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন সবার সাথে আবার বহুদিন পর দেখা হচ্ছে। এভাবে যেতে যেতে শেষে তার বাড়ির কর্মচারীকে দেখায় শেষ হয়ে গেল। আর প্রতিবিম্ব নেই, মোমবাতিও নিভে গেছে কখন টের পায়নি। বাতাস তো আসার কথা না, কিভাবে নিভল? উত্তর ভাবতে ভাবতে মেঝেতে পড়ে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে আসল। এটা শেষ হাইপার শিফট ছিল না, আরও আছে।

৪.

চোখ খুলে দেখে ফায়াদ মেঝেতে শুয়ে আছে। খেয়াল করল এটা আগের টাইমলাইনটাই। তাহলে কি হলো? আবার এখানেই কেন জাগনা পেল? সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এতক্ষণ শুধুই কি ঘুমালো? জানালা সরিয়ে দেখল সবাই বাড়িতে ঢুকে গেছে, সব বাড়িতে আলো। তার খুব মাথা ধরছে। একটু কফি খেতে মন চাচ্ছে। কোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটার সময় মনে করার চেষ্টা করছে অ্যাক্সেস কতদূর। খেয়াল করে দেখল তার কলোনির সব বাড়িতে কে কোথায় থাকে তার জানা। একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কে আছে জানা। সে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল, একটা জিনিস আজব লাগছে, এবার কোনো এরোর না, এবার তার স্মৃতিই তাকে উদ্ভট জিনিস বলছে মনে হচ্ছে। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার মনে হচ্ছে তার সব বন্ধু, আত্মীয়, সহকর্মী, পরিচিত লোক যাদের আয়নায় দেখল, তারা তার এই কলোনিতেই এই মুহূর্তে আছে। একেকজন একেক বাড়িতে। তার মাথা ধরছে। কিভাবে সম্ভব? তারা এখানে কেন? এই মানুষগুলো তার কলোনির লোক না। তারা ফায়াদের পরিচিতরা, জীবিত, যারা মারা গেছে তারাও, সবাই। তার মন বলছে তারা এই কলোনিতেই এই মুহূর্তে আছে, একেকজন একেক বাড়িতে, কে কোথায় আছে জানে। সে জানে না এবার কি হবে। কিন্তু যাকে এতক্ষণ খুঁজছিল অন্য টাইমলাইনগুলোতে, যার সাথে দেখা করবে, সে-ও এখানেই। তার বাড়ি এখানে কোনটা-জানা আছে। বাড়িতে গিয়ে ডাকল। কেউ শুনল না। দরজা খুলে ভেতরে গেল। দেখল বাড়ি ফাঁকা। সে কি এখানে নেই? দরজা বন্ধ করে বের হয়ে আসল। বের হয়ে দেখল একটু আগেই যে আলো জ্বলছিল বাড়িগুলোতে, মানুষের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, এখন আর কিছু নেই। যেন একসাথে সবাই গায়েব। পুরো কলোনি ফাঁকা নিমেষেই। ফায়াদ হাঁটছে, তার মাথায় আর কিছুই ঢুকছে না। আর চিন্তা করতে মন চাচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে ঠান্ডা গলায় একটা কণ্ঠ শোনা গেল, "হ্যালো ফায়াদ"। ফায়াদ থেমে গেল। ভয় পায়নি, সে জানে এই কণ্ঠ কার, অতিপরিচিত। কিন্তু ফায়াদ ঘুরছে না পেছনে। সে জানে সে মারা গেছে। এখন তাকে দেখলে যদি জ্ঞান হারায় আগের মত? সিস্টেম তো তাকে অতীতের মৃত মানুষের সাথে দেখা করতে দেয় না। প্রত্যেকবার এমন হয়েছে! কিন্তু তার খুব পেছনে ঘুরতে মন চাচ্ছে, তার সাথে কথা বলতে মন চাচ্ছে। এভাবে প্রায় এক মিনিট পার হলো। আবার শোনা গেল,"তুমি কি পেছনে ঘুরে তাকাবে না?" ফায়াদ চুপ করে আছে, কথা বলতে মন চাচ্ছে না। সে তো আসল মানুষ না। সে মারা গেছে। তাকে দেখে কি হবে? কিন্তু তারপরও খুব পিছে ঘুরে দেখতে মন চাচ্ছে। "তোমার সময় চলে যাচ্ছে, নয় মিনিট আছে। তুমি না আমাকে খুঁজছিলে কিছুক্ষণ আগে? এখন কথা বলবে না?"

ফায়াদ মুখ খুলল,“সাহারা, তুমি কি সত্যি এখানে?”

“পিছনে ঘুরে দেখ সত্যি কিনা।“

ফায়াদ ঘুরে দাঁড়াল। স্থির, নিথর সময়। ফায়াদ নিজের হৃদপিণ্ডের ছন্দ শুনতে পাচ্ছে। দেখে তার চোখে অশ্রু চলে আসল। কিন্তু কাঁদছে না। তাকিয়ে আছে স্থিরভাবে। “ফায়াদ তুমি কি জানো? তোমাকে দাড়িটা বেশ ভালোই মানিয়েছে। তোমাকে দাড়িতে কোনোদিন দেখিনি।“ ফায়াদ চুপচাপ। “আমার দেওয়া কলমটা এখনও তোমার পকেটে?”

“হ্যাঁ।”

“তোমার কেমন লাগছে?”

ফায়াদকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কিন্তু এই মুহূর্ত তার জীবনে আর আসবে না, সে জানে। তাকে দেখে বোঝা যাবে না আসলে তার মনে এই মুহূর্তে একের পর এক সুন্দর স্মৃতির কথা আসছে, সে হাসতে চাচ্ছে, চোখকে আনন্দে অশ্রুসিক্ত করতে চাচ্ছে। এমন যেন সে যা চেয়েছিল, পেয়ে গেছে। এখন আর এই সিস্টেমের ব্যাপারটা তার মাথাতেই নেই। সব গল্প সাহারাকে শোনাতে চাচ্ছে। কিন্তু সময় বেশি নেই, হবে না এর মধ্যে। ফায়াদ জিজ্ঞেস করল,”১০ মিনিট কেন? এর বেশি হতে পারত না?” সাহারা বলল,“পারত, কিন্তু যেহেতু হয়নি, কি আর করার? তুমি তো কিছুই বলছ না।“ ফায়াদের কি বলবে বুঝছে না। এতক্ষণে সিস্টেমের সব অ্যাক্সেস তার মাথায় চলে এসেছে, সব মনে পড়েছে। সিস্টেম তাকে একের পর এক টাইমলাইন ঘুরিয়ে শেষ এই টাইমলাইনে এনেছে। এতো ঘোরাঘুরির পর তার রিওয়ার্ড হলো- সে তার জীবনের পরিচিত যেকোনো মানুষের সাথে একবার দেখা করতে পারবে, জীবিত বা মৃত। কিন্তু সময় ১০ মিনিট। তাকে খুঁজতে হলে এই কলোনির ঐ বাড়িতে যেতে হবে যেখানে ফায়াদের মন বলছে সে থাকতে পারে। কিন্তু তার খোঁজ করার পর পুরো কলোনি ফাঁকা, আর কারও সাথে দেখা করার সুযোগ নেই। এরপর এই শেষ হাইপার শিফটের ইতি। সাহারা জিজ্ঞেস করল,”এতজন থাকতে আমি কেন?” ফায়াদ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলতে চাচ্ছে, পারছে না। এই নীরবতাই ভালো লাগছে। সাহারা বলল,”জানো ফায়াদ? সেদিন আসলে আমি দেরি করতাম না। আমি একটা গিফ্ট র‍্যাপ করতে যেয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল।“ ফায়াদের মনে পড়ে গেল, সেদিন সাহারাকে নিয়ে মিউজিয়াম দেখতে যেত, সে অপেক্ষা করছিল। সাহারা বলল,“তুমি কি পরে পেয়েছিলে তোমার উপহারটা?” ফায়াদ জানে সাহারা সবই জানে, তবুও উত্তর দিতে মন চাচ্ছে।

“হ্যাঁ, খুব সুন্দর ছিল ফুলদানিটা।”

“ধন্যবাদ, জানো ফায়াদ? আমিও অপেক্ষায় ছিলাম সেদিন।“

“কার অপেক্ষায়?”

সাহারা উত্তর দিল না। ফায়াদ জিজ্ঞেস করল,“তুমি কি এই জগতে সেদিন থেকে আছো?”

“বলতে পারো অমনই। তোমার কেমন লাগলো?”

“আমার তো ঘুরতে ঘুরতে মাথা ব্যথা হয়ে গেল।“ দুইজনই হালকা হেসে উঠল। “তুমি নিশ্চয়ই ঐ শপে গিয়েছিলে যেদিন প্রথম দেখা হয়। কিন্তু দেরি করে ফেলেছ!” বলে হাসতে লাগল দুইজনই। “সময়মতো গেলেও হয়ত কিছু হতো না, আগেই অজ্ঞান হতাম।“

“তা ঠিক। কিন্তু তুমি যাতে আগে না যাও, সিস্টেম এভাবেই সাজানো।” ফায়াদ কথা শুনে হাসছে, বহুদিন পর এভাবে হাসছে। সাহারাও হাসছে, হঠাৎ বলে উঠল, “সময় শেষের দিকে।” ফায়াদের খুব ইচ্ছে করছে কোনোভাবে যদি সময়টা বাড়ানো যায়! কিন্তু অসম্ভব।

“ফায়াদ, তুমি কি বাকিটুকু জেনেছ?”

“কোনটা?”

“আফজাল মারা যাওয়ার পরও কেন দেখতে পেয়েছিলে? অজ্ঞান হওনি?”

“না।”

“আফজাল মারা যায়নি, ফায়াদ।” ফায়াদ আবার বিস্মিত। “কিন্তু...”

“আমি জানি তোমার মনে হচ্ছে ও মারা গেছে, তুমি নিজেই ওর অ্যাক্সিডেন্ট হতে দেখেছ, আমার মতোই হয়েছিল। আমি মারা গেছি সত্য, কিন্তু ঐদিন ওটা আফজাল ছিল না।“ ফায়াদ কি বলবে বুঝতে পারছে না।

“জানো ফায়াদ? তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোর মৃত্যুর পিছনে ইনডাইরেক্টলি আফজাল জড়িত। যেদিন ফাহমিদা মারা যায়, ক্রিমিনালদের কাছে ওর পরিচয় আফজাল দিয়েছিল। যখন তোমরা একই এলাকায় থাকতে, যেদিন তোমার বাবা-মা অ্যাক্সিডেন্ট করে, ঐদিন রাস্তায় আফজাল ছিল। সে দেখেও কিছু করেনি, ঠিকই দূর থেকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখছিল। আর আমার মৃত্যুর দিনে ফায়াদ নিজেই লোক ঠিক করে রেখেছিল, আমি অপেক্ষায় ছিলাম তুমি আসবে, আসোনি। এগুলো কি জানতে?”

ফায়াদ জানে না কিছুই, বুঝছে না কি বলবে? আফজাল তার বন্ধু, ও কেন?

“কিন্তু ফায়াদ, তোমার আসল জগতে ফেরত যাওয়ার জন্য কিন্তু আফজালের সাথে হাত মেলাতে হবে। পারবে তো? তোমার টাইমলাইনে আফজাল খারাপ কেউ না, বললাম তো, অজান্তেই এমন হয়েছে, কিন্তু আমারটা প্ল্যান্ড ছিল। জানি না কেন। আসলে তোমার কাছে যারা প্রিয়, তাদের ভাগ্যে এটা লিখিত, এটা চেঞ্জ করার কোনো উপায় নেই। যাই হোক, শেষ মুহূর্তে আর কিছু না বলি। তুমি আমাকে আবার তোমার সাথে এভাবে দেখা করার সুযোগ দিলে, এজন্য ধন্যবাদ। ভালো থেকো ফায়াদ, নিজের খেয়াল রেখো।“

ফায়াদ খেয়াল করল, এবার সাহারার চোখেও পানি এসেছে। কিন্তু সাহারা তো সিস্টেমের একটা প্রোগ্রাম, তার চোখে কি পানি আসার কথা ছিল? মনে হয় না, কিন্তু এসেছে, এটা আসলেই কি সাহারা ছিল?

কয়েক সেকেন্ড পর সাহারা বাতাসে মিলিয়ে গেল, ফায়াদ খেয়াল করল ও হঠাৎ আফজালের বাসায়, ঐ যে প্রথম হাইপার শিফটে যে মুহূর্তে হাত মেলাতে পারেনি, একদম ওখানেই ফেরত এসেছে, হাত মেলানোর সাথে সাথে শেষ হাইপার শিফটের পর সে আসল জগতে ফিরে আসবে।

ফেরত এসেছে। চোখ খুলে দেখল আফজাল একটা চেয়ারে একহাতে সিগারেট, আরেক হাতে পিস্তল নিয়ে বসে আছে। ফায়াদ বুঝল সে মাটিতে, শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। ৩০ সেকেন্ড সময় আছে। সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ফায়াদ বলে উঠল,“কেন? আফজাল, তুমি কেন?” আফজাল প্রশ্ন শুনেছে, উত্তর দিচ্ছে না। ও ভাবছে ওর বন্ধুকে মারার পর তার গলার স্বর কানে ভেসে আসছে। ফায়াদের খুব জানতে ইচ্ছে করছে আফজালের উত্তরটা, শেষবারের মতো বলল,”কেন আফজাল? উত্তর দেবে না?“ আফজাল ফায়াদের চোখের দিকে তাকালো, দৃষ্টি স্থির, আফজাল কেঁদে ফেলল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। আফজাল ১১টা হাইপার শিফট পার করে এসেছে। তার জন্য অনেককে মারা যেতে হয়েছে। আর ভালো লাগছে না। ফায়াদ চোখ বন্ধ করার পর আফজাল চোখের পানি মুছল। শুধু একটাই জিনিস চাচ্ছে- এটা যেন তার শেষ হাইপার শিফট হয়। শেষে তার বন্ধুকেও মারতে হলো। কিন্তু সে জানে না, চোখ খুললে কি সে আসল জগতে ফেরত যাবে? নাকি শুরু হবে নতুন কোনো হাইপার শিফট?

রহস্য ঘেরা এই জগৎ

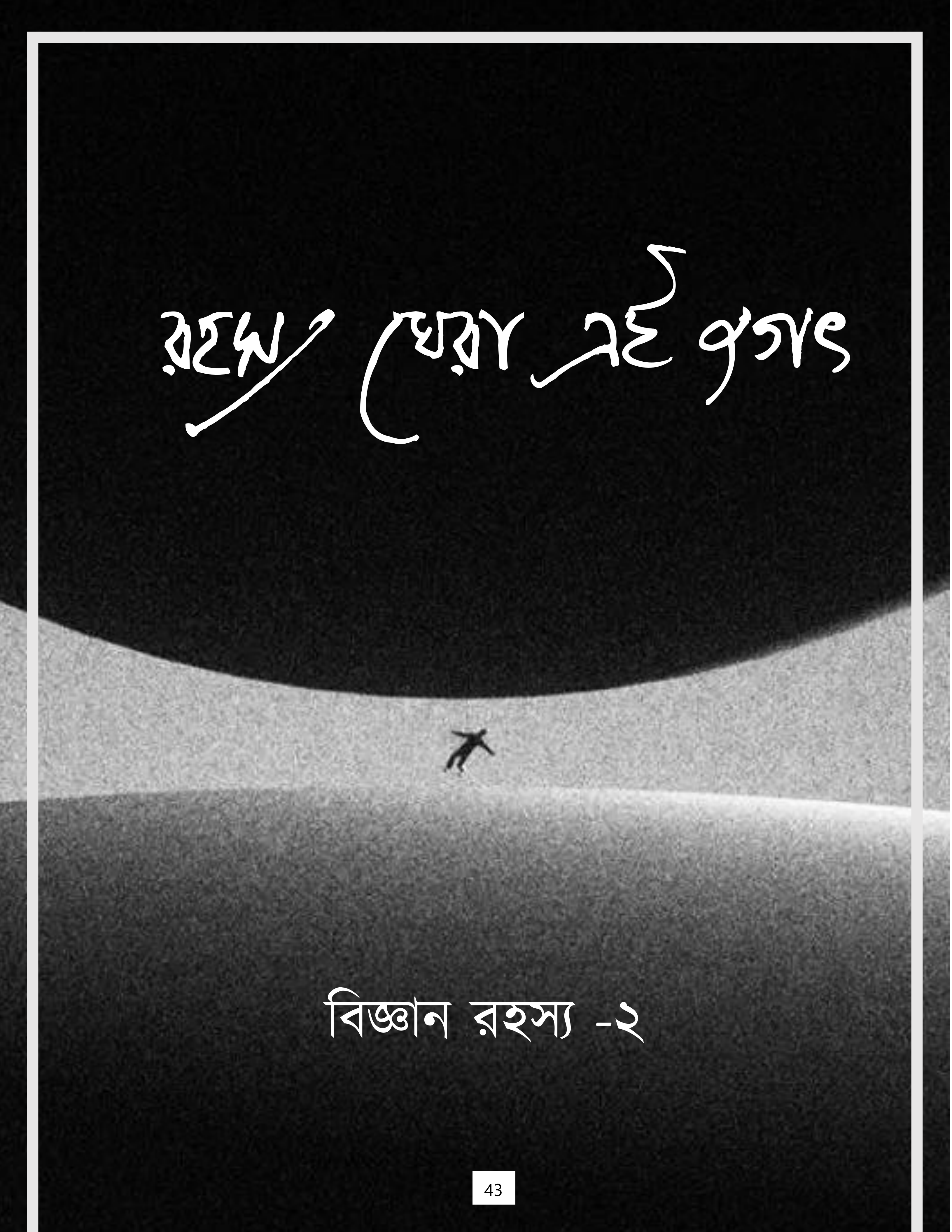

বিজ্ঞান রহস্য -২

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ

এক অন্ধকার জগতের গল্প

আহসান হাবিব

আমরা সবসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, ওই দূর নক্ষত্রের মাঝে কী লুকিয়ে আছে। মহাকাশের অসীম শূন্যতা আমাদের চুম্বকের মতো টানে। কিন্তু আমরা কি কখনো আমাদের পায়ের নিচের কত কি আছে সেটা নিয়ে সেরকম ভাবি? প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ঠিক পূর্বে সমুদ্রের বুকে এক বিশাল, প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকার ফাটল রয়েছে। এটাই মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। এর গভীরতম বিন্দু, 'চ্যালেঞ্জার ডিপ' এতটাই গভীর যে, আপনি যদি ৮,৮৪৮ মিটার উঁচু মাউন্ট এভারেস্টকে এই খাদের ভেতর ডুবিয়ে দেন, তাহলেও এভারেস্টের চূড়া থেকে জলের উপরিভাগ পর্যন্ত আরও প্রায় ২ কিলোমিটারের বেশি জায়গা পুরোপুরি ফাঁকা পড়ে থাকবে! ১১,০৩৪ মিটার গভীর এই জায়গাটা আসলে কেমন? সেখানে কি আদৌ কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? এই চরম বৈরী এবং রহস্য ঘেরা জগতের উত্তর খুঁজতে গেলে পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানের চেনা সূত্রগুলো যেন মুহূর্তেই খেই হারিয়ে ফেলে।

আমরা যখন ভূত্বক বা টেকটোনিক প্লেটের কথা পড়ি, তখন একটা সাধারণ প্রশ্ন মাথায় আসে—পৃথিবীর পৃষ্ঠ কি চিরকাল একই রকম ছিল? উত্তর হলো, না। এই প্লেটগুলো সবসময় চলমান এবং মাঝে মাঝে দুটো প্লেটে সংঘর্ষ ও হয় বা দুটো একত্রিত হয়ে বিশেষ কাছু সৃষ্টি করে। যেমন মাউন্ট এভারেস্ট, দুটো প্লেটের সংঘর্ষে ভূত্বক উপরে উঠে যায়। সংঘর্ষে শুধু ভূত্বক উপরেই ওঠে না মাঝে মাঝে ভিতরেও ঢুকে যায় যার উদাহরণ ভয়ংকর মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট যখন তুলনামূলক ছোট মারিয়ানা প্লেটের নিচে তলিয়ে যায় বা সাবডাকশন (Subduction) ঘটে, ঠিক তখনই তৈরি হয় এই বিশাল ফাটল। ভূতত্ত্বের ভাষায় এটি প্যাসিফিক 'রিং অফ ফায়ার'-এর একটি অত্যন্ত সক্রিয় অংশ। তবে যেভাবেই এটি সৃষ্টি হোক এর বর্তমান পরিস্থিতি পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান সব দিক থেকেই কোনো সায়েন্স ফিকশন এর থেকে কম না।

যেখানে পদার্থবিজ্ঞান এর হিসাব থেমে যায়ঃ

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, মারিয়ানা ট্রেঞ্চের কথা ভাবলেই সবার আগে মাথায় আসে 'হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার' বা তরলের চাপের কথা। আমরা জানি, তরলের গভীরতা যত বাড়ে, তার চাপও তত বাড়ে। সূত্রটা আমাদের সবারই জানা: P = h(rho)g। কিন্তু চ্যালেঞ্জার ডিপের তলদেশে এই চাপের মাত্রা ঠিক কতটা ভয়ানক, সেটা কল্পনা করাও কঠিন। সেখানে চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশি! এসআই (SI) এককে হিসেব করলে, এই চাপের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০৮.৬ মেগাপ্যাসকেল (MPa)।

সহজ কথায় বললে, আপনার শরীরের প্রতি বর্গমিটারে যদি প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন ভর চাপিয়ে দেওয়া হয়(অনেকটা একটা বিশাল প্লেন এর নিচে আপনি চাপা পড়লে যে অবস্থা হবে তার থেকেও ভয়াবহ) , মারিয়ানা ট্রেঞ্চের তলদেশে পানির চাপ ঠিক তেমনই মনে হবে। সাধারণ কোনো মেটাল সাবমেরিন সেখানে গেলে মুহূর্তের মধ্যে দুমড়েমুচড়ে টিনের ক্যানের মতো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হলো, পদার্থবিজ্ঞানের বইতে আমরা

সাধারণত পড়ি যে পানি অসংকোচনশীল। কিন্তু এই বিশাল চাপে পানির ঘনত্বও প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে যায়! অর্থাৎ, তাত্ত্বিকভাবে সেখানকার পানি পৃষ্ঠতলের পানির চেয়ে বেশি ঘন এবং ভারী।

চাপের পাশাপাশি রয়েছে নিকষ কালো অন্ধকার আর হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। সমুদ্রের এই স্তরটিকে বলা হয় 'হেডাল জোন', গ্রিক পাতাল দেবতা 'হেডিস'-এর নামানুসারে। এখানে সূর্যের আলোর একটি ফোটন কণাও পৌঁছাতে পারে না। চিরস্থায়ী এই অন্ধকারে পানির স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকে ২৭৪ থেকে ২৭৭ কেলভিনের (১ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) কাছাকাছি। কিন্তু এই হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রার মধ্যেও এক অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যায়। ট্রেঞ্চের ফাটলগুলোর ভেতর দিয়ে পৃথিবীর ভেতরের ম্যাগমা থেকে তৈরি হওয়া 'হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট' বা উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই ভেন্টগুলো দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে প্রায় ৫৭৩ থেকে ৬৭৩ কেলভিন (৩০০ থেকে ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রার ফুটন্ত খনিজ মিশ্রিত তরল বেরিয়ে আসে। কিন্তু চারপাশের অকল্পনীয় চাপের কারণে এই পানি বাষ্পীভূত হতে পারে না, তরল অবস্থাতেই থাকে। একদিকে প্রায় ২৭৩ কেলভিনের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, অন্যদিকে ৬৭৩ কেলভিনের ফুটন্ত পানি—এ যেন এক চরম থার্মোডাইনামিক প্যারাডক্স!

প্রাণের অস্তিত্বঃ

Seadevil Anglerfish

এমন চরম পরিবেশেও যে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ আবিষ্কার এর আগে পর্যন্ত মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল । কারণ, এই প্রচণ্ড চাপে যেকোনো সাধারণ প্রাণীর কোষের আবরণ বা সেল মেমব্রেন একদম শক্ত হয় জমে যাওয়ার কথা। প্রোটিনগুলো তাদের স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিক গঠন হারিয়ে ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু এখানেই জীববিজ্ঞান আমাদের চমকে দেয় ।

এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত সব প্রাণী! পৃথিবীর অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের মতো এখানকার খাদ্যশৃঙ্খল সূর্যের আলোর ওপর নির্ভর করে না। সালোকসংশ্লেষণ এখানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এখানকার পুরো ইকোসিস্টেম বা খাদ্যশৃঙ্খল দাঁড়িয়ে আছে কেমোসিন্থেসিস-এর ওপর। হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট থেকে নির্গত হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মিথেন গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে এক বিশেষ ধরণের এক্সট্রিমোফাইল ব্যাকটেরিয়া খাদ্য তৈরি করে। আর তাদের খেয়েই বেঁচে থাকে বাকি প্রাণীরা। এছাড়া ওপরের স্তর থেকে মৃত প্রাণী এবং জৈব বর্জ্য বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে, যাকে বলা হয় 'মেরিন স্নো'। এই মৃত জৈব কণাগুলোই এখানকার প্রাণীদের অন্যতম প্রধান খাবার।

এই ট্রেঞ্চ এর প্রজাতিগুলোর বেঁচে থাকার রহস্যঃ

বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখেছেন, এই গভীরতায় টিকে থাকার জন্য প্রাণীরা আণবিক পর্যায়ে এক বিস্ময়কর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এখানকার প্রাণীদের কোষে ট্রাইমিথাইলামিন এন-অক্সাইড (TMAO) নামক একটি পিয়েজোলাইট প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি মূলত এক ধরনের রাসায়নিক বর্ম, যা জলের অণুগুলোকে প্রোটিনের ভেতরে ঢুকে তাকে ধ্বংস করতে বাধা দেয় এবং প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও প্রোটিনের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখে। মাছ যত গভীরে যায়, তার শরীরে TMAO-এর পরিমাণ তত বাড়ে। এর কারণেই গভীর সমুদ্রের মাছের গায়ে অদ্ভুত এক ধরনের তীব্র গন্ধ থাকে।

ট্রেঞ্চের তলদেশে দেখা মেলে জেনোফাইওফোর (Xenophyophores)-এর। এরা মূলত এককোষী অ্যামিবা জাতীয় জীব, কিন্তু এক একটা কোষ মানুষের হাতের মুঠোর সমান বড় হতে পারে! এরা সমুদ্রের তলদেশের কাদা থেকে সীসা, ইউরেনিয়াম এবং পারদের মতো বিষাক্ত ভারী ধাতু শোষণ করে নিজেদের চারপাশে একটা খোলস তৈরি করে। দেখা মেলে অদ্ভুত দর্শন অ্যামফিপড-এর, যেগুলো দেখতে অনেকটা চিংড়ির মতো, কিন্তু খোলসটা প্লাস্টিকের মতো স্বচ্ছ আর নরম। এদের পেটে এমন কিছু শক্তিশালী এনজাইম বা উৎসেচক পাওয়া গেছে যা এমনকি কাঠও হজম করতে পারে!

সবচেয়ে অবাক করা প্রাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'মারিয়ানা স্নেইলফিশ'। প্রায় আট হাজার মিটার গভীরে সাঁতার কাটা এই মাছগুলোর কোনো শক্ত আঁশ নেই, হাড়গুলো তরুণাস্থির মতো অত্যন্ত নরম, এবং এদের মাথার খুলিটা পুরোপুরি জোড়া লাগানো নয়। নরম ও জেলির মতো শরীরের কারণেই এরা প্রচণ্ড পানির চাপ শুষে নিতে পারে। এদের জিনোম সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অন্ধকারের কারণে এদের দৃষ্টিশক্তির জিনগুলো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কোষ মেরামতের জিনগুলো সাধারণ মাছের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সক্রিয়।

আলোহীন এই জগতে অনেক প্রাণীই নিজেদের যোগাযোগের জন্য, ভয় দেখানোর জন্য বা শিকার ধরার জন্য নিজেদের শরীরে আলো তৈরি করে, যাকে বলা হয় 'বায়োলুমিনেসেন্স'। মাথার ওপর একটা ছোট বাতির মতো অঙ্গ ঝুলিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকা অ্যাংলারফিশ এর সবচেয়ে ক্লাসিক উদাহরণ। অন্ধকারে মোহনীয় নীল বা সবুজ

আলো জ্বেলে এরা বোকা শিকারকে নিজের মৃত্যুর দিকে টেনে আনে। আলো দিয়ে বোকা বানানোর এই কৌশল জীববিজ্ঞানের এক মাস্টারক্লাস।

মানুষ কি কখনো এই ট্রেঞ্চ এর গভীরে গিয়েছিল?

মানুষের কৌতূহল তো আর কোনো সীমানা বা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার মানে না। ১৯৬০ সালে প্রথমবারের মতো সুইস ইঞ্জিনিয়ার জ্যাক পিকার্ড এবং মার্কিন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ডন ওয়ালশ 'ট্রিয়েস্ট' নামক একটি বিশেষভাবে তৈরি বাথিস্কেফে চড়ে নেমেছিলেন চ্যালেঞ্জার ডিপের তলদেশে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে নিচে নামার সময় ৯ হাজার মিটার গভীরতায় তাদের সাবমেরিনের বাইরের একটি অত্যন্ত পুরু প্লেক্সিগ্লাস কাঁচ প্রচণ্ড চাপে ফেটে গিয়েছিল! তারপরও তারা হাল ছাড়েননি। জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তারা তলদেশে পৌঁছান এবং সেখানে মাত্র ২০ মিনিটের মতো অবস্থান করেন।

এরপর দীর্ঘ ৫২ বছর সেখানে কোনো মানুষ যাওয়ার সাহস করেনি। অবশেষে ২০১২ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জেমস ক্যামেরন তাঁর 'ডিপসি চ্যালেঞ্জার' সাবমেরিনে করে একাকী এই ভয়ংকর গভীরতায় পৌঁছান। সাবমেরিনটি এমন একটি বিশেষ 'সিনট্যাকটিক ফোম' দিয়ে তৈরি ছিল যা প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। তবুও,

পানির এতই চাপ ছিল যে ক্যামেরনের সাবমেরিনটি লম্বায় প্রায় ৭.৬ সেন্টিমিটার সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল! তিনি সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটান এবং প্রচুর নতুন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন।

আর সাম্প্রতিক সময়ে, ২০১৯ সালে এক্সপ্লোরার ভিক্টর ভেসকোভো তার 'লিমিটিং ফ্যাক্টর' সাবমেরিন নিয়ে সেখানে গিয়ে নতুন গভীরতার রেকর্ড গড়েন। কিন্তু সেখানে এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হন তিনি। এত গভীরে, পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম জায়গায় গিয়েও ভিক্টর আবিষ্কার করেছিলেন মানুষের তৈরি একটি প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ আর কিছু চকলেটের মোড়ক! মানুষের দূষণ যে পৃথিবীর গভীরতম বিন্দুতেও পৌঁছে গেছে, এটি আমাদের তথাকথিত উন্নত সভ্যতার জন্য এক বিশাল অশনিসংকেত।

জ্যাক পিকার্ড (১৯২২-২০০৮)

শেষ কথা:

আমরা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরের মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করতে পেরেছি, চাঁদের মাটিতে রোভার চালিয়েছি, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে ১৩০০ কোটি বছর আগের মহাবিশ্বের আদিমতম গ্যালাক্সিগুলোর ছবি তুলছি। মহাকাশ গবেষণায় আমরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের গ্রহের সমুদ্রের তলদেশের মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ জায়গা আমরা আজ পর্যন্ত এক্সপ্লোর করতে পেরেছি। বাকি ৯৫ শতাংশ এখনো আমাদের কাছে দূর মহাকাশের মতোই এক অজানা, অচেনা এবং অন্ধকার রহস্য।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে, মারিয়ানা ট্রেঞ্চের এই চরম পরিবেশের জীববিদ্যা আমাদের ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধান দিতে পারে। বৃহস্পতির উপগ্রহ 'ইউরোপা' বা শনির উপগ্রহ 'এনসেলাডাস'-এর কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পুরু বরফের পৃষ্ঠের নিচে যে বিশাল তরল মহাসাগর রয়েছে, হয়তো সেখানেও হাইড্রোথার্মাল ভেন্টকে ঘিরে এভাবেই গড়ে উঠেছে কোনো এলিয়েন সভ্যতা! পৃথিবীর গভীরতম এই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা অদ্ভুত প্রাণীগুলো হয়তো আমাদের শেখাচ্ছে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও কীভাবে প্রাণের সন্ধান করতে হবে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যতই উন্নতি হোক না কেন, প্রকৃতির এই আদিম, অন্ধকার আর ভয়ংকর সুন্দর রূপ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়—আমাদের জানা সীমানার বাইরে অজানার পরিধিটা ঠিক কতটা বিশাল।

পরার্থপর বিজ্ঞান

মো: হামিন মাহফুজ ইশরাক

সকল ক্ষেত্রে উপকারী তুমি
বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী-
তোমার উপর সর্বদা নির্ভরতা সকলেরই।
যেথায় দেখি তোমাকেই খুঁজি, ব্যবহারে যে তুমিই শ্রেষ্ঠ,
তুমি ব্যতিরেকে কার্য সিদ্ধ হবে নাকো কখনো।
তোমার পানে চেয়ে থাকে মন- নতুন খোঁজের সন্ধানে –
সকলের জন্য জনদরদী তুমি,
নিস্তব্ধ ঝিনুক যেন।
কখনো কারো কল্প তুমি, কখনো কারো প্রতীক্ষা,
কখনো আবার নিত্যদিনের রূপকথা।
সকল ভাবনা তোমাকেই ঘিরে,
তুমি যেন পথের দিশারী রূপে –
সকলের মনে জায়গা করে আছো।
কখন দেখাবে পথ,
তোমারে দেখানো পথের মোরা পথিক মাত্র পর।।

আরো একবার ভাবো

(প্রশ্নপর্ব)

সমস্যা-০১

তিনজন বন্দিকে শর্ত দেওয়া হলো—"তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ১০০% নিশ্চিত হয়ে নিজের মাথার টুপির রং সঠিকভাবে বলতে পারলে, তোমাদের তিনজনকেই মুক্তি দেওয়া হবে। তবে শর্ত একটাই, তোমাদের যা প্রশ্ন করা হবে তার সঠিক উত্তর দিতে হবে। "

তাদের সামনে ৬টি টুপি রাখা হলো—৪টি কালো এবং ২টি সাদা। এরপর তাদের এক লাইনে এমনভাবে দাঁড় করানো হলো যেন, ৩য় জন (সবার পেছনের জন) তার সামনের দুজনকে দেখতে পায়। ২য় জন শুধু সামনের ১ম জনকে দেখতে পায়। আর ১ম জন কাউকেই দেখতে পায় না। ঘাড় ঘোরানো সম্পূর্ণ নিষেধ।

নিয়ম হলো, জল্লাদ একে একে পেছন থেকে প্রশ্ন করবে, "তুমি কি তোমার টুপির রং নিশ্চিতভাবে জানো?" জানলে তাকে সঠিক রংটি বলতে হবে, আর না জানলে বলতে হবে "জানি না"।

জল্লাদ প্রথমে ৩য় জনকে প্রশ্ন করল। সে সামনের দুজনের টুপি দেখে হিসাব করে বলল, "না, আমি জানি না।"

তার উত্তর শুনে জল্লাদ ২য় জনকে একই প্রশ্ন করল। সে সামনের ১ম জনকে দেখে বলল, "না, আমিও জানি না।"

এবার ১ম জনের পালা। জল্লাদ যখন জিজ্ঞেস করল,"তুমি কি তোমার টুপির রং জানো?" সে বলল , "হ্যাঁ আমি জানি।" সে তার টুপির রং বল এবং তিনজনকেই মুক্তি দেওয়া হলো।

এখন তুমি কি বলতে পারবে তাদের কার মাথায় কোন রঙের টুপি ছিল?

সমস্যা-০২

রাজার ভল্টে ১০০০ বোতল মহামূল্যবান ওয়াইন আছে। কিন্তু খবর এলো, বিশ্বাসঘাতক কেউ একজন এই ১০০০ বোতলের মধ্যে ঠিক যেকোনো একটি বোতলে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। এই বিষের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি খাওয়ার সাথে সাথে কিছু হয় না; ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর মানুষের মৃত্যু হয়।

রাজার কাছে সময় আছে মাত্র ২৪ ঘণ্টা।(অর্থাৎ দ্বিতীয় বার কোনো পরীক্ষার সুযোগ নেই। তিনি শুধু একটা cycle সম্পন্ন করতে পারবেন) এর মধ্যেই তাকে বের করতে হবে কোন বোতলটিতে বিষ আছে। বিষ টেস্ট করার জন্য রাজার কাছে ১০ জন বন্দি আছে। শর্ত হলো, চাইলে একজন বন্দিকে একাধিক বোতলের ওয়াইন একসাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যাবে।

এখন রাজা কীভাবে ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০০% নিশ্চিতভাবে বিষাক্ত বোতলটি খুঁজে বের করবে।

সমস্যা-০৩:

৫ জন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ১০০% লজিক্যাল এবং চরম স্বার্থপর জলদস্যু (A, B, C, D, E) মিলে ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা ভাগ করবে।

নিয়ম হলো:

সবচেয়ে সিনিয়র দস্যু (A) প্রথমে ভাগাভাগির একটা প্রস্তাব দেবে। যদি অন্তত ৫০% দস্যু (A-সহ) প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, তবে সেভাবেই ভাগ হবে। আর যদি প্রস্তাবটি ৫০% ভোট না পায়, তবে A-কে সাগরে ফেলে হাঙর দিয়ে খাওয়ানো হবে এবং পরবর্তী সিনিয়র (B) নতুন প্রস্তাব দেবে।

প্রত্যেক দস্যুর প্রধান লক্ষ্য দুটো (ক্রমানুসারে):

১. যেকোনো মূল্যে নিজের জীবন বাঁচানো।

২. নিজে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া।

এখন প্রশ্ন হলো A কীভাবে মুদ্রার ভাগাভাগির প্রস্তাব দিলে সে নিজের জীবনও বাঁচাবে এবং সবচেয়ে বেশি স্বর্ণমুদ্রাও নিজের পকেটে ভরবে?

Hints:

প্রশ্নকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকো, প্রশ্ন নিজেই উত্তর দিয়ে দিবে।

(আমাদের ফেসবুক পেজ এ কিছুদিন পর এগুলোর সমাধান দিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর আগেই তোমরা নিজেরাই সমাধান বের করতে পারবে।

ধন্যবাদ

পরবর্তী ম্যাগাজিনের জন্য লেখা পাঠানোর ঠিকানা

ইমেইলঃ rgcscienceclub@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপঃ 01842437737 (Sajeeb)

01847741974 (Ahsan)

All writing rights reserved

Image sources: Pinterest, Wikipedia